ডঃ মুস্‌তাফা আস্‌ সিবায়ী

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী

ইসলাম ও
পাশ্চাত্য সমাজে নারী

মূল
ড. মুসতাফা আস্-সিবায়ী

অনুবাদ
আকরাম ফারুক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহ্মদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ISBN 984-842-016-9

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১
পঞ্চম প্রকাশ : মুহাররাম ১৪৩১
পৌষ ১৪১৬
জানুয়ারী ২০১০

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ঃ একশত টাকা মাত্র

Islam O Paschatyo Somaje Nari **Written by Dr Mustafa As-Sibayee Translated by Akram Farooque Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 First Edition September 1991 Fifth Edition January 2010 Price Taka 100.00 only.**

www.amarboi.org

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ॥ ৫

২, ভাষণের মুখবন্ধ ॥ ৭

৩. নারী স্বাধীনতা যুগে যুগে ॥ ৯

৪. নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা ॥ ১৭

৫. ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মুসলিম নারীর অবস্থা ॥ ৩৪

৬. নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ॥ ৩৬

৭. বহু বিবাহ ও ইসলাম ॥ ৪৬

৮. তালাক প্রসঙ্গ ॥ ৮১

৯. নারীর রাজনৈতিক অধিকার ॥ ১০১

১০. নারীর সামাজিক অধিকার ॥ ১০৯

১১. নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ॥ ১২৩

১২. উপসংহার ॥ ১৩৮

www.amarboi.org

ডক্টর মুস্তাফা আস্-সিবায়ী সিরিয়ার একজন শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক ও নেতা ছিলেন। কিছুকাল তিনি সিরিয়ার বিখ্যাত ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মারাকিবে আম অর্থাৎ সভাপতি ছিলেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে সিরিয়ায় সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার আগে তিনি সিরীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও আসীন হন। তিনি বেশ কিছুকাল সিরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যজগতে তাঁর ব্যক্তিত্ব নতুন করে পরিচিতির অপেক্ষা রাখেনা। এক কথায় বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর মুসলিম দুনিয়া যে কয়জন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদের জন্ম দিয়েছে, ডক্টর মুস্তাফা আস্ সিবায়ী তাঁদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত উঁচু মানের কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে "আল-মারয়াতু বাইনাশ্ শরীয়াতি ওয়াল কানুন" তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী" তাঁর উক্ত গ্রন্থেরই প্রত্যক্ষ অনুবাদ। এ গ্রন্থ দ্বারা তিনি তথাকথিত নারী স্বাধীনতাবাদীদের ইসলাম বিরোধী অপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং একমাত্র ইসলামই যে নারীর যথার্থ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, তা যুক্তির নিরিখে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

ডক্টর আস্-সিবায়ীর উল্লেখযোগ্য অপরাপর গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নরূপ ঃ

১. আখলাকুনাল ইজতিমাইয়াহ- (আমাদের সামাজিক আচরণ)

২. আস্সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্তাশরী'-(আইন রচনায় সুন্নাহর ভূমিকা)

৩. উযামা-উনা ফিত্ তারীখ - (আমাদের বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব)

৪. হাযা হুয়াল ইসলাম - (ইসলাম পরিচিতি)

৫. মিম রাওয়ায়ি হাযারাতিনা - (ইসলামী সভ্যতার চমকপ্রদ দিকসমূহ)

৬. আহকামুস্ সিয়াম ওয়া ফালসাফাতুহু - (রোযার আইনগত ও দার্শনিক দিক)

৭. আহকামুল মাওয়ারীস - (ইসলামের উত্তরাধিকার আইন)

www.amarboi.org

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মাদের (সা) ওপর, তাঁর স্বজনগণের ওপর, তাঁর নিষ্কলুষ ও কল্যাণময় সহচরগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন তাঁদের ওপর।

আমার এ গ্রন্থখানা মূলত ১৯৬১-১৯৬২ সালে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় প্রদত্ত আমার একটি বক্তৃতা। এ বক্তৃতা দু'ঘন্টার বেশী সময় স্থায়ী ছিল। ঐ ভাষণে আমি সময়ের স্বল্পতা হেতু কোন কোন বিষয়ে খুবই দ্রুত গতিতে ও সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রেখেছিলাম। পরে যখন দমেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত রীতি মোতাবেক ঐ ভাষণটিকে ঐ বছরের বক্তৃতামালা-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন আমার সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত বক্তব্যগুলোকে বিশদভাবে উপস্থাপন করা জরুরী মনে করলাম। সেই সাথে আলোচিত প্রতিটি বিষয়কে ইসলামী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা, পশ্চিমা নারীদের সম্পর্কে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত ঘটনাবলী দ্বারা এবং পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা তখনো ভারসাম্য হারাননি ও চরমপন্থীদের অতিরঞ্জিত বক্তব্যকে সমর্থন করেন না, তাঁদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক মনে করলাম। কারণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের লেলিয়ে দেয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রীড়নকরা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা অব্যাহত রাখতো যেন মুসলিম দেশগুলোতে তাদের শাসন ও শোষণকে বৈধ ও সংগত প্রমাণ করা যায়, এবং পাশ্চাত্যের সরলমতি সাধারণ জনমানসকে বুঝানো যায় যে, এ সকল মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুধু বৈধই নয়, বরং একটি দুর্লভ নিয়ামত, অধিবাসীদেরকে সভ্যতা শিখানোর একটা পন্থা, এবং তাদের ধারণামতে ঐ সব দেশে প্রচলিত খারাপ আইন রচনার ধারা বিলোপের একটা প্রশংসনীয় ব্যবস্থা।

গ্রন্থাকারে ছাপানোর সময় এতে আমি বক্তৃতার আকারে উপস্থাপনের সময় আলোচিত বহু বক্তব্যে অধিকতর ধারালো যুক্তি ও প্রমাণাদি সংযোজিত করেছি। শুধুমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সত্যের ওপর পরিচালিত হামলা প্রতিহত করাই ছিল এই সংযোজনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নারীর সমস্যা সম্পর্কে আমি সব সময় একপেশে যুক্তি প্রমাণের আধিক্য লক্ষ্য করেছি। আলোচ্য গ্রন্থে আমি অপর পক্ষের যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরেছি। এ প্রসংগে আমি যে কথাটি

www.amarboi.org

সব সময় জোর দিয়ে বলে থাকি এবং এখন আবারো বলছি তা এই যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় নারীর সাথে শত্রুতাও নয়, বন্ধুত্বও নয়, যদিও এক শ্রেণীর মানুষ সুবিদিত উদ্দেশ্যেই এরূপ ধারণা পোষণ করতে মজা পায়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, একটি চরিত্রবান ও অটুট নীতির অনুসারী মুসলিম সমাজে নারীর সঠিক স্থান ও ভূমিকা চিহ্নিত করা।

আমাদের বক্তব্য এর চেয়ে বেশী নয় যে, নারীকে আমাদের সমাজে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তার আইনসম্মত অধিকার বহাল করতে হবে, এবং তার নারীত্ব যেন শোষণের শিকার হয়ে নিপীড়ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পাশ্চাত্য সমাজে নারীর যে শোচনীয় দুর্গতি আজকাল হচ্ছে এবং যার কারণে তাদের মধ্যকার বুদ্ধিজীবীরা ও স্বাধীন বিবেকের অধিকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আমাদের নারীদেরকে সেই পরিণতি থেকে সর্বপ্রথমে রক্ষা করতে হবে।

যে অটুট নৈতিক ভিত্তির ওপর ইসলাম আমাদের সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানব সমাজের যুগ যুগ কালের অভিজ্ঞতা যাকে নির্ভুল প্রমাণিত করেছে, সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা সফল হোক- মহান আল্লাহর নিকট এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মুস্তাফা আস-সিবায়ী

দামেস্ক ঃ ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬২

www.amarboi.org

ভাষণের মুখবন্ধ

নারীর সমস্যা আধুনিক ও প্রাচীন যুগের সমাজেরই সমস্যা। কেননা সংখ্যার দিক থেকে নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধেক, স্নেহ ভালোবাসা ও আবেগের দিক দিয়ে সমাজের উৎকৃষ্টতম এবং সমস্যার বিচারে সমাজের জটিলতম সমস্য। এ কারণে সকল যুগের চিন্তাবিদগণ নারীর সমস্যাকে গোটা সমাজের সমস্যা হিসাবে দেখেছেন ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। তবে অধিকাংশ পুরুষ নারীকে পুরুষের একটি পরিপূরক ও সৌন্দর্যবর্দ্ধক জুড়ি বলে মনে করে থাকে।

আমি এ ভাষণে নারীর সমস্যার সকল দিক নিয়ে আলোচনা করবো না। আসলে এ বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর ও ব্যাপক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে এখনো ভয় পাই। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত বন্ধুর, পিচ্ছিল ও স্পর্শকাতর এবং এ বিষয়ের পাঠক বা শ্রোতা কেউই তেমন সুবিচারক হয় না।

আমাদের যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ এটি প্রচারণার যুগ। আমাদের চিন্তায়, মননে, গ্রহণে ও বর্জনে প্রচারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। নারী সংক্রান্ত বিষয়েও প্রচার খুবই মারাত্মক ভূমিকা রেখেছে। জনমতকে তা এমন ভয়ংকরভাবে এলোমেলো ও বিশৃংখল করে দিয়েছে, আবেগ অনুভূতি ও কামনা বাসনাকে এত অদম্য করে দিয়েছে এবং সত্যের উজ্জ্বল ও উদার চেহারাকে এমনভাবে ধামাচাপা দিয়েছে, যে তা গবেষকদেরকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। একটা শ্রেণী নারীকে শুধু ভালোবাসে। আর অপর শ্রেণী তার কট্টর দুশমন। তবে এই শ্রেণী-বিভক্তির মূলে রয়েছে ভুল বুঝাবুঝি এবং সত্য থেকে বিচ্যুতি। কেননা আমি এমন কোন পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারিনা যে নারীর শত্রু হতে পারে। কারণ নারী তো তার মা, অথবা স্ত্রী, অথবা মেয়ে, অথবা বোন, অথবা অন্য কোন আপনজন। সে নিজের মা, স্ত্রী, মেয়ে অথবা বোনের শত্রু হতে যাবে কেন এবং তা কল্পনাই বা করা যায় কিভাবে? সে যদি তার মাকে, স্ত্রীকে, মেয়েকে অথবা বোনকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখতে চায়, তবে সেটা এ জন্যই করতে চায় যে, সে তাতে প্রথমত তার আত্মীয়ার কল্যাণ অতঃপর সমাজের কল্যাণ দেখতে পায়। তাকে কোন কিছু দেয়া বা না দেয়ায় শত্রুতা বা বন্ধুত্বের প্রশ্ন ওঠেনা। এতে কেবল সম্ভাব্য কল্যাণ বা অকল্যাণের প্রশ্নই জড়িত থাকতে পারে।

যারা নারীর ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করেনা এবং তাদেরকে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিণী হবার প্ররোচনা দেয়, তাদেরকে নিছক দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচারণার কল্যাণেই নারীর বন্ধু বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমার জিজ্ঞাসা ঃ নারীর বন্ধু হওয়ার অর্থ কি তার যাতে দুর্নাম হয় ও কলংক রটে, তার যাতে স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, অথবা তার যাতে সামাজিক ও মানসিক দুর্দশা বাড়ে, তা করতে উৎসাহিত করা? যে বন্ধু তার অপর বন্ধুর প্রতি এরূপ

www.amarboi.org

আচরণ করতে চায়, সে আসলে তার শত্রু– চাই সে তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি নমনীয় হয়ে যতই উদার ও দরদী কণ্ঠে কথা বলুক না কেন। এ প্রসংগে জনৈক বিজ্ঞজনের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে যিনি বলেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি তোমাকে সত্য কথা বলে সে-ই তোমার বন্ধু– যে ব্যক্তি তোমার সব কাজ ও কথাকে সমর্থন করে, সে নয়।" সুতরাং এ যুগের নারীর কল্যাণ কিসে হবে, তা নিয়ে দ্বিমত পোষণকারীদেরকে নারীর শত্রু ও বন্ধু– এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার এ ভাষণে আমি বিষয়টির শুধু সেই সব দিক নিয়ে আলোচনা করবো, যা নিয়ে আমি পুংখানুপুংখ গবেষণাও চালিয়েছি, বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। জাতির সার্বিক পুনর্গঠন সাধ্যমত চেষ্টা করা একজন নাগরিক হিসাবে আমার দায়িত্ব– এই অনুভূতি থেকেই আমার এ চেষ্টার সূচনা। সর্বোপরি, যে জিনিসটি আমাকে এ বিষয়ে লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে, তা এই যে, আমি বিশ্বাস করি, মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা এবং চিন্তার ফল ব্যক্ত করার স্বাধীনতার ওপরই তার মর্যাদা ও সম্মান নির্ভরশীল। মুসলিম জাতির কল্যাণ সম্পর্কে গভীরভাবে ও আন্তরিকতার সাথে চিন্তাভাবনা করতে আমি যে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা বোধ করি, তা জনতার উচ্ছ্বসিত ও প্রশংসাধন্য হাততালি দ্বারাও যেমন প্রভাবিত হয়না, তাদের উপেক্ষা বা বিরক্তি প্রকাশেও তা ম্লান হয় না। যে সত্যকে আমি উপলব্ধি করি ও বিশ্বাস করি, সে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন এবং অন্যায় ও অসত্যের গড্ডালিকায় ভেসে যাওয়াকে আমি সত্য কথা বলে জনতার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার শিকার হওয়ার চেয়েও ভয়ংকর মনে করি।

www.amarboi.org

নারী স্বাধীনতা যুগে যুগে

ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে প্রাচীন মানব সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল ও আছে, সর্বপ্রথম তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা জরুরী মনে করছি। নারীর এই আইনগত ও সামাজিক অবস্থা যিনিই ন্যায়নিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করবেন, তার কাছে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা নিষ্ঠুর আচরণে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ করেনি। এ সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি।

গ্রীসে নারীর অবস্থা

প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বেরুত না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ীর ভেতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলণ ছিল। তবে আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলতো। যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তার কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিলনা। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তারা পুরুষের দাসীবাদীর ন্যায় জীবন জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেওয়া হতো না। বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন কোন নারী যখন তালাক চাইবার জন্য আদালতে যেত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওঁত পেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়ামাত্র পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

অবশ্য স্পার্টাবাসী কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। তাকে উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনদেনের এখতিয়ার দিয়েছিল। তবে

www.amarboi.org

এটা তাদের পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিলনা। এর কারণ ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সর্বক্ষণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো, তাই তারা তাদের অনুপস্থিতিকালে গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীদের ওপর ন্যস্ত রাখতো। এ কারণে স্পার্টার মহিলারা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর মহিলাদের চেয়ে বেশী রাস্তায় বেরুতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। তথাপি এরিস্টটল নারীকে এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীর নিন্দা করতেন এবং এই অধিকার প্রদানকেই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী করতেন।

অতঃপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভাসমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নিলর্জ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দুষণীয় মনে হতোনা। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্মও নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী 'আফ্রোদাইতি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে সে 'কিওপিড' নামক যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শন স্বরূপ "হারমোডিস ও আরাসতোজেন" নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।

রোমান সমাজে নারী

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক– তাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকতো না। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হতো। পিতা যখন তাকে ধরে ওপরে তুলতো, তখন প্রমাণিত হতো যে, সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, অন্যথায় ধরে নেয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপাসনালয়ের বেদীতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো, নচেত শিশু ক্ষুধায়, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুকে ধুকে মরতো।

পরিবারপ্রধান ইচ্ছা করলে যে কোন বহিরাগতকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতো এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো, দাসদাসীর মত বিক্রি করে পরিবার থেকে বের করে দিতে পারতো। অতঃপর এক সময় বিক্রির অধিকার তিনবার নাগাদ সীমিত করে দেয়া হয় নয়া আইন জারীর মাধ্যমে। পিতা কর্তৃক নিজ পুত্রকে বিক্রি করা

www.amarboi.org

দুইবারের বেশী হলে ঐ পুত্রের ওপর আর পিতার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা থাকতো না। তবে সন্তান যদি মেয়ে হতো, তাহলে তাকে আজীবন পিতার অনুগত থাকতে হতো। ছেলে মেয়ের বয়স যতই হোক, তাদের ওপর পিতার কর্তৃত্ব পিতার মৃত্যু পর্যন্তই বহাল থাকতো। সন্তানের ন্যায় নিজের স্ত্রীর ওপর, নিজের পুত্রদের স্ত্রীদের ওপর এবং পৌত্রদের স্ত্রীদের ওপরও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব বজায় থাকতো। এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাতো বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। অন্য কথায় বলা যায়, পরিবারের ওপর পরিবারপ্রধানের কর্তৃত্ব ছিল মালিকানামূলক, সংরক্ষণমূলক নয়। পরিবারপ্রধানের এই কর্তৃত্ব ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনানের সময় খর্ব করা হয় এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু মারপিট করার চেয়ে বেশী কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।

পরিবারের প্রধান পরিবারের সকল সহায় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হতো। পরিবারের কোন সদস্য কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না। পরিবারের সদস্যরা নিছক পরিবারপ্রধানের সম্পত্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার গণ্য হতো। পরিবার প্রধানই এককভাবে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিত এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামতের তোয়াক্কা করতো না।

অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যাশিশুর আদৌ কোন মালিকানা অধিকার থাকতো না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিণত হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে। এমনকি মেয়ের বয়োপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসাবে পাবে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবেনা, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে স্থির করা হয় যে, মেয়ে যে সম্পদ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন করবে, অথবা তার পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে, সে সম্পত্তি ঐ মেয়েরই মালিকানাধীন বিবেচিত হবে। তবে পরিবারপ্রধান যে সম্পত্তি তাকে দেবে সে সম্পত্তির মালিকানা পরিবার প্রধানেরই থাকবে এবং তার অনুমতি ছাড়া মেয়ে তা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারবে না।

পরিবারপ্রধান মারা গেলে বয়োপ্রাপ্ত পুত্রসন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতোনা। কন্যা যতদিন বেঁচে থাকতো, ততদিন অন্য একজন অভিভাবক তার মনিব হতো। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধিত হয়। আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরূপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনোপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হবে যে,

www.amarboi.org

এই আত্মবিক্রির উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এই চুক্তির কারণে নতুন মনিব তাকে তার পছন্দমত যে কোন কাজে বাধা দিতনা। আর যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে "সার্বভৌমত্ব চুক্তি" নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে হতো। অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিতে হতো। এই চুক্তি সম্পাদিত হতো তিনটি উপায়ে ঃ

১. পুরোহিতের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।
২. প্রতীকি ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যথারীতি মূল্য দিয়ে কিনে নিত।
৩. বিয়ের পর পুরো এক বছর স্বামীর সাথে বসবাসের মাধ্যমে।

এভাবে পরিবারপ্রধান নিজের কন্যার ওপর থেকে পিতৃত্বের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতো এবং এ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হতো স্বামীর নিকট। মোটকথা পরিবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব খানিকটা শিথিল হয় এবং তা প্রভুত্ব থেকে একধাপ নেমে তত্ত্বধায়কসুলভ কর্তৃত্বের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নারীর অধিকার পুরোপুরি বহাল হয়নি।

নাগরিক অধিকারের পথে তিনটি জিনিস রোমান আইনে পরবর্তীকলেও অন্তরায় বিবেচিত হতে থাকে। এই তিনটি জিনিস হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, বুদ্ধির অপরিপক্কতা এবং নারী হওয়া। প্রাচীন রোমান আইনবিদগণ নারীদেরকে নাগরিক অধিকার না দেয়ার প্রধান কারণ হিসাবে দায়ী করতেন তাদের বুদ্ধির স্বল্পতাকে। জাস্টিনিয়ানের জারীকৃত আইনে এই বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করার চেষ্টা করা হয় মাত্র। এ আইনে বলা হয় যে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য দু'রকম যোগ্যতা প্রয়োজন ঃ আইনগত যোগ্যতা ও বাস্তব যোগ্যতা।

আইনগত যোগ্যতার অভাব হেতু তিন শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের তথা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত হয়। এরা হচ্ছে ঃ ১. দাসদাসী ২. বিদেশী ৩. পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী ও মেয়েরা। আর বাস্তব যোগ্যতার অভাব হেতু যে চার শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তারা হচ্ছে ঃ

১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা বালক-বালিকা ২. বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগ্রস্ত ৩. ঋণগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ও স্ত্রীগণ, ৪. অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণ।

অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে নারীদের জন্য অভিভাবক থাকার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় উপরোক্ত চতুর্থ অবস্থাটা আর টিকে থাকেনি। তথাপি এসব প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীন নারীগণ ঋণগ্রস্ত থাকলে পুরোপুরিভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হতো না।

["রোমান আইনের ইতিহাস" - ডক্টর মারুফ দাওয়ালিবী, "গ্রীসের নারী" ও "রোমান সমাজে নারী" - ডক্টর মাহমুদ সালাম জান্নাটী দ্রষ্টব্য]

www.amarboi.org

হামুরাবীর আইনে নারী

হামুরাবীর আইনে নারীকে গৃহপালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হতো। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক, সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

(হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক রাজা নমরূদ ধ্বংসের পর ইরাকের সবচেয়ে নামজাদা রাজা ছিলেন হামুরাবী।)

হিন্দু মতে নারী

প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই মত পোষণ করতো যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

মনু সংহিতায় পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সারা জীবন তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিলনা। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সতিদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর এই প্রথা বিলোপ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের তা মনোপুত ছিলনা। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।

কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে ঃ বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা - এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।

প্রাচীন জাতিসমূহের প্রবাদ বচনে নারী

একটি চীনা প্রবাদে আছে ঃ "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করোনা।"

একটি রুশ প্রবাদে আছে ঃ "দশটি নারীর মধ্যেও একটির বেশী আত্মা থাকেনা।"

একটি স্পেনীয় প্রবাদে বলা হয়েছে ঃ "দুষ্টা নারীকে এড়িয়ে চল। তবে বিদুষী নারীর প্রতিও ঝুঁকে পড়োনা।

একটি ইটালীয় প্রবাদে বলা হয়েছে ঃ "ঘোড়া চটপটে বা অলস যাই হোক, তাকে চালাতে চাবুক ব্যবহার কর। আর নারী সতীই হোক আর অসতীই হোক - তাকে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা কর।"

ইহুদী সমাজে নারী

ইহুদী জাতির কোন কোন গোষ্ঠীতে মেয়েকে দাসীর পর্যায়ে রাখা হয়। তার পিতা তাকে বিক্রি করে দিলেও দিতে পারে। কেবলমাত্র পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান

www.amarboi.org

পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তাওরাতে আছে ঃ "আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিলনা। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদেরকে উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।" অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে শুধু সেই ক্ষেত্রেই বোন উত্তরাধিকার পেত। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এ ক্ষেত্রে বিয়ের সময় বোন ঐ ভাই এর কাছ থেকে খোরপোশ ও মোহরানার সমপরিমাণ এককালীন সম্পত্তি লাভ করতো। পিতা যদি ভূসম্পত্তি রেখে যেত, তবে ভাই তাকে কিছু ভূসম্পত্তি দিত। কিন্তু পিতা যদি অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যেত, তাহলে সে যত সম্পত্তি রেখে যাক, বোন ভাই এর কাছ থেকে তার কানাকড়িও পেতনা।

আর পুত্র সন্তান মোটেই না থাকার কারণে যখন কন্যা পিতার উত্তরাধিকার পেত, তখন তার ওপর এই কড়াকড়ি আরোপিত থাকতো যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে ও উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেনা।

এ ছাড়া ইহুদীরা সচরাচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বলা হয়েছে ঃ "স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এ রকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না।"

খৃষ্ট সমাজে নারী

প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধপতন দেখে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং এ সব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতো। তাই খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশী সম্মানার্হ, তারা ঘোষণা করে দিলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশ দ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা নারীর সৌন্দর্য হলো বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।

তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বললেন ঃ "নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান ভংগকারী এবং আল্লাহর চেহারা (অর্থাৎ পুরুষকে) বিস্মৃতকারী।"

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেন ঃ "নারী এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"

www.amarboi.org

পঞ্চম শতাব্দীতে "মাকোন" একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, না কি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমী সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মারীয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারীনী নয়।

পাশ্চাত্য জগত খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খৃস্টাব্দে (যখন রাসূল (সা) এর বয়স ১৭ বছরের কাছাকাছি) ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, না কি অমানুষ বলে? অবশেষে স্থির করা হয় যে, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। এমনকি যে যুগে নারীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো, পুরুষ যোদ্ধারা তাদের সাথে প্রণয় বিহার করে বেড়াতে লাগলো এবং তাদের মর্যাদা খানিকটা উন্নীত হলো বলে মনে হতে লাগলো, সে যুগটিও সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার দিক দিয়ে নারীর জন্য সুখকর প্রমাণিত হয়নি। কেননা এ যুগেও তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় থাকতে হয় এবং নিজের অর্থসম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হাত দিতে পারতোনা।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৮০৫ সাল পর্যন্তও বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচশো পাউন্ডে বেচে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললো যে, বৃটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের বৃটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিক্রি করা হলে সে জন্য ছয় পেনস মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল। আদালত জবাবে বলেন যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদন্ড প্রদান করে।

আগের বছর ইটালীতে স্ত্রী বিক্রির আরেকটি ঘটনা ঘটে। জনৈক ইটালীয় নিজের স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষের দিকের কয়েক কিস্তি বাকী থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে। (মাজাল্লাতু হাযারাতিল ইসলাম, ২য় বর্ষ, পৃঃ ১০৭৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তি দানের কথা ঘোষণা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা পুনর্বহাল হলোনা। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিত হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হলো। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী শিশু ও পাগল - এই তিন শ্রেণীর মানুষ

www.amarboi.org

অধিকারহীন ও দায়দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু এর পরও বিবাহিত নারীর কিছু কিছু তৎপরতার ওপর কড়াকড়ি বহাল থাকে। এ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করবো।

প্রাগৈসলামিক আরবে নারীর অবস্থা

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী আরবের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, আরব নারীও বহু সংখ্যক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীর না ছিল উত্তরাধিকার, না ছিল স্বামীর কাছে কোন অধিকার, না ছিল বিয়ে ও তালাকের সংখ্যার কোন সীমা। স্বামীকে স্ত্রীর ক্ষতি সাধনে বাধা দিতে পারে এমন কোন বিধিব্যবস্থা সেখানে ছিলনা। অনুরূপভাবে নিজের স্বামী নিজে পসন্দ করবে এ অধিকার সাধারণ আরব নারীর ছিলনা। কেবল কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, অভিজাত শ্রেণীর আরব সরদারগণ বিয়ের ব্যাপারে তাদের মেয়েদের মতামত গ্রহণ করতেন।

কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রী রেখে মারা যেত এবং অন্য স্ত্রীর উদরজাত কিছু পুত্র সন্তান থাকতো, তখন পিতার রেখে যাওয়া স্ত্রীকে অর্থাৎ নিজের সৎমাকে বিয়ে করা ঐ পুত্র সন্তানেরই অগ্রাধিকার বিবেচিত হতো। পিতার অন্যান্য সম্পত্তির মতই তা নিছক তার উত্তরাধিকার বলে গণ্য হতো।

মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে তারা ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করতো। কোন কোন গোত্র নবজাত মেয়েকে আভিজাত্যের কলংক ভেবে এবং কেউবা খাদ্য যোগাতে পারবেনা এই আশংকায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলতো। এটা অবশ্য সমগ্র আরবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কোন প্রথা ছিলনা এবং কুরাইশ গোত্রেও এর প্রচলন ছিলনা।

সে যুগের নারীর একটি মাত্র গর্বের বিষয় ছিল এই যে, পুরুষরা সর্বশক্তি দিয়ে নারীর জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করতো এবং তার অবমাননার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তোনা। এই দিক দিয়ে আরব নারী তৎকালীন সারা দুনিয়ার নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল।

www.amarboi.org

নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে, যখন সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে বিশ্বের সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে নারীর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন আরব উপদ্বীপের মরুময় পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে সেই ঐশী বাণী ঘোষিত হলো, যা নারীকে দিল সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্মানজনক অবস্থান, যা তাকে দিল সকল অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে, যা তাকে অতীতের সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও অপমান থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিল, যা তার পূর্ণাংগ মনুষ্য ও মানবসুলভ অধিকারের নিশ্চয়তা দিল, যা তাকে পাশবিক যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি দিল এবং সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধানে ও ঐক্যসংহতি রক্ষায় তাকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ দিল।

মুহাম্মাদ (সা) এর মুখ দিয়ে ইসলাম নারী সম্পর্কে যে সংস্কারমূলক নীতিমালা ঘোষণা করলো, তার সার সংক্ষেপ নিম্নে কর্ণনা করছি ঃ

প্রথমতঃ মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সব রকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করা হলো। আল কুরআনে মহান আল্লাহ বললেন ঃ "হে মানব জাতি, তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত-১) আর রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন ঃ "নারীগণ পুরুষদেরই সহোদরা।" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ইত্যাদি)

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী ধর্মমতের অনুসারীরা নারীকে যে একটা অভিশাপস্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস ও সমাজের গলগ্রহ রূপে চিহ্নিত করতো, সেই মানসিকতাকে ইসলাম প্রতিহত করলো! অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ইসলাম আদম (আ) এর জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হাওয়াকে দায়ী করেনি, বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে। আদম (আ) এর ঘটনা বর্ণনাকালে আল্লাহ বলেন ঃ "শয়তান তাদের দু'জনেরই সেই বৃক্ষের ব্যাপারে পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যে স্থানে ছিল সেখান থেকে বহিষ্কার করালো।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ ৩৬)

আদম ও হাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ "শয়তান তাদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দিল যাতে তাদের ঢেকে রাখা লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দিতে পারে।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০)

তাওবার ব্যাপারেও তাদের উভয়কে সমভাবে অংশীদার করেছে ঃ "তারা উভয়ে বললো ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজদের ওপর অত্যাচার করে বসেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২৩)

www.amarboi.org

এমনকি আল কুরআনের কোন কোন আয়াতে এই পাপটির জন্য এককভাবে শুধু আদমকে দায়ী করা হয়েছে। যেমন ঃ "আর আদম স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করলো। ফলে সে বিপথগামী হলো।" (সূরা তোয়াহা)

অতঃপর আর একটি নীতি ঘোষণা করতঃ নারীকে তার জননী হাওয়ার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করলো। যথাঃ "তারা অতীত মানব গোষ্ঠী। তারা যা কিছু করেছে তার জন্য তারা দায়ী, আর তোমরা যা কিছু করেছ তার জন্য তোমরা দায়ী। তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা কখনো জিজ্ঞাসিত হবেনা।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ ৩৬)

তৃতীয়তঃ পুরুষের মত নারী যদি সৎ কর্মশীলা হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদাত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো। পক্ষান্তরে সে অসৎকর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, সে যদি মুমিন হয়, তবে তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই পবিত্র ও নিরাপদ জীবন যাপন করাবো এবং তার কৃত সৎ কর্মের বিনিময়ে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করবো।" (সূরা আন নাহল ঃ ৯৭) আল্লাহ বলেন ঃ "অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মকে নষ্ট করিনা- চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

লক্ষ্য করুন আল কুরআন নিম্নের আয়াতে উভয়ের সমমর্যাদার ওপর কত জোর দিয়েছে ঃ "নিশ্চয় মুসলিম নারী ও পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারিনী, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী, ধৈর্যধারী ও ধৈর্যধারিনী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী স্ত্রী, সদকা প্রদানকারী ও সদকা প্রদানকারিনী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার স্ত্রী, সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী স্ত্রী এবং আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী- এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৫)

চতুর্থতঃ ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এই মানসিকতা শুধু যে তৎকালীন আরব সমাজেই ছিল তা নয়, বরং আজও বহু জাতির মধ্যে বিরাজমান, এমনকি কিছু কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যেও আমি এই মানসিকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এই জঘন্য অভ্যাসের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন ঃ "তাদের কেউ যখন মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর শুনতে পায়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে যায়। প্রাপ্ত খবরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় সে জনগণের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় আর ভাবে, অপমান সত্ত্বেও ঐ সন্তানকে কি সে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? জেনে রাখ, তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট।" (সূরা আন নাহল ঃ ৫৯)

পঞ্চমতঃ ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে। আল্লাহ বলেন ঃ "(স্মরণ কর

www.amarboi.org

সেই সময়টিকে) যখন মাটিতে প্রোথিত মেয়েশিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি কারণে তাকে হত্যা করা হলো।" (সূরা আত্ তাকভীর ঃ ৯)

"যারা নিজেদের সন্তানকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" (সূরা আল-আনয়াম ঃ ১৪০)

ষষ্ঠতঃ ইসলাম নারীকে সম্মান করতে ও মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মেয়ে হিসাবেও, স্ত্রী হিসাবেও এবং মা হিসাবেও।

মেয়ে হিসাবে তাকে মর্যাদা দিতে কিভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তার নমুনা নিম্নের হাদীসটিতে পাওয়া যাবে ঃ "যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম বিদ্যা ও উত্তম আচরণ শেখায়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।"

নারীকে স্ত্রী হিসাবেও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ "আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর রুম ঃ ২১)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে উৎকৃষ্টতম সম্পদ হলো সৎকর্মশীলা স্ত্রী। তার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দিত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে স্বামীর মর্যাদা ও সুনাম সংরক্ষণ করে। (সহীহ্ মুসলিম ও ইবনে মাজা)

নারীকে মা হিসাবে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে।" (সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার সেবা পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে কার বেশী? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মার। লোকটি বললো ঃ তারপর কার? তিনি বললেন ঃ তোমার মার। লোকটি আবার বললো ঃ তারপর কার ? তিনি বললেন ঃ তোমার মার। লোকটি পুনরায় বললো ঃ তারপর কার? তিনি বললেন ঃ তোমার বাবার।" (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

"আর এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললো ঃ আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল (সা) বললেন তোমার মা কি বেঁচে আছেন? সে বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে সব সময় তার পায়ের কাছে থাক। কেননা ওখানেই জান্নাত রয়েছে।" (তাবারানী)

সপ্তমতঃ নারীকে শিক্ষা দানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস তো ইতিপূর্বেই এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানকে ভালো বিদ্যা ও সদাচার শিক্ষা দিলে জান্নাত অবধারিত। এ ছাড়া অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নরনারীর ওপর ফরয।" (বায়হাকী)

www.amarboi.org

অষ্টমতঃ ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে, তা সে মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা-যাই হোক না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ও সে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

নবমতঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ "স্ত্রীদের যেমন দায়ত্বদায়িত্ব রয়েছে তেমনি নায়সংগত অধিকারও রয়েছে। তবে তাদের ওপর পুরুষদের কিছু অগ্রাধিকার রয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২২৮)

দশমতঃ তালাকের সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যাতে স্বামী কোন রকমের স্বেচ্ছাচারমূলক বা অত্যাচারমূলক আচরণ করতে না পারে। এ জন্য তালাকের সীমা নির্দ্ধারণ করেছে এভাবে যে, তা সর্বোচ্চ তিনটের বেশী হতে পারবেনা। আবরদের সমাজে তালাকের কোন সীমা সংখ্যা ছিলনা। তাছাড়া তালাক কার্যকর করার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এরপর একটা ইদ্দতের মেয়াদ নির্দ্ধারণ করেছে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের প্রতি সমঝোতায় প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ এনে দেয়। এ বিষয়ে আমরা কিছুটা সবিস্তারে অচিরেই আলোচনা করবো।

একাদশতঃ ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে। অথচ সমকালীন আরবে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে কোন সীমা সংখ্যার বালাই ছিলনা।

দ্বাদশতঃ নারীকে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে এবং এই অভিভাবকসূলভ কর্তৃত্ব কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাদীক্ষা, তদারকী ও তার কোন সম্পদ থাকলে তার তত্ত্বাবধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অভিভাবকত্বের নামে তার দন্ডমুন্ডের মালিক হতে বা তার ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালাতে ইসলাম কাউকে অনুমিত দেয়নি। আর বয়োপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কেউ ক্রয় বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, বন্ধক, ইজারা, শরীকী ব্যবসায় ইত্যাকার যাবতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতায় ও অধিকারে আদৌ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেনা।

উল্লিখিত ১২টি মূলনীতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও মানানসই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো ঃ

১. মানবিক ক্ষেত্র ঃ এ ক্ষেত্রে সে নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার ও তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, নতুবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

www.amarboi.org

২. সামাজিক ক্ষেত্র ঃ ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্দ্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মানও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষতঃ বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালোবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩. আইনগত ক্ষেত্রঃ বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।

কিছু কিছু পার্থক্য

এসব সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মানবতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম মানুষে মানুষে ও নরনারীতে যে সাম্যের সৃষ্টি করেছে, তার সাথে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম এ পার্থক্যগুলো অনুমোদন করেছে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদে। এবারে এই পার্থক্যগুলো কোথায় কোথায় অনুমোদন করা হয়েছে তার বিবরণ দিচ্ছি ঃ

১. সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে

কারো পাওনা বা অধিকার নিরুপণের জন্য যে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সত্যভাষী পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছে। ঋণ দানের বিধান সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ "তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। দু'জন পুরুষ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এমন একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর, যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।" (সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৮২)

মানবতা, মর্যাদা এবং যোগ্যতার সাথে যে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই, তা সুস্পষ্ট। নারী মানুষ হিসাবে পুরুষের মতই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, এবং পুরুষের মতই অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন। একজন পুরুষের সাথে সাক্ষী হিসাবে দু'জন স্ত্রীলোকের শর্ত আরোপের কারণ তার সম্মান ও মর্যাদাকে খাটো করে দেখা নয়, বরং এর কারণটি তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম যদিও নারীকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করেছে, তথাপি তার ওপর যে বিশেষ সামাজিক দায়িত্বটি অর্পণ করেছে তা হলো পরিবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। এ দায়িত্বটি তাকে বেশীর ভাগ সময় নিজের বাড়ীর

www.amarboi.org

অভ্যন্তরে কাটাতে স্বভাবতই বাধ্য করে, বিশেষতঃ বেচাকেনার সময়টিতে। আর এ থেকেই বুঝতে পারি যে, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য দান অত্যন্ত বিরল ঘটনা হ'য়ে থাকে। এ ধরনের লেনদেনের কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যদিবা কখনো সে পায়, তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ওটাকে স্মরণে রাখতে আগ্রহী হবে- এটা তার পক্ষে স্বভাবিক নয়। সে বরঞ্চ চলার পথে হয়তো একটা ভাসা ভাসা নজর বুলিয়েই চলে যাবে এবং তার প্রতি তেমন গভীরভাবে মনোযোগ দেবেনা। এরপর ঐ ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে সে যখন বিচারকের সামনে দাঁড়াবে, তখন তার খানিকটা ভুলেও যেতে পারে, ঘটনার চিত্র তার স্মৃতিপটে বিকৃতও হ'য়ে যেতে পারে, অথবা প্রকৃত সত্যের সাথে তার কল্পনাও মিশ্রিত হতে পারে। অপর এক মহিলাও যখন একই ঘটনার সাক্ষ্য দেবে তখন তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা। মানুষের পাওনা বা অধিকার এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে সাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক এবং সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী। এ কারণেই মহিলা সাক্ষীর ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সাক্ষীর বিধান দিয়েছে। বিষয়টি আল কুরআনে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে যে, "যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"

নারীর এই মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বহু সংখ্যক ফিকাহশাস্ত্র বিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আদৌ গ্রহণ করা যাবেনা বলে রায় দিয়েছেন। এর কারণ এটাই যে, নারীর অধিকাংশ সময় নিজ বাড়ীতে সাংসারিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কথা এবং সেইসব দ্বন্দ্বকলহের জায়গাগুলোতে তার উপস্থিত থাকার কথা নয় যেখানে হত্যাকান্ড বা অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর কদাচিত যদিবা উত্তেজনার স্থলে উপস্থিত হয়েই বসে, তবে হত্যার ন্যায় দৃশ্য সচক্ষে দেখা পর্যন্ত তার ঐ জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকার কথা নয়। বরঞ্চ তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে, ওখান থেকে পালাতে না পারলেও চোখ বুঝে থাকবে এবং চিৎকার করবে। এমনকি সে মুর্ছাও যেতে পারে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য দেয়া, অপরাধ, অপরাধী, অপরাধ সংগঠনের হাতিয়ার ও কিভাবে তা সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত সঠিক বিবরণ দেয়া কিভাবে সম্ভব? ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধির যাবতীয় দন্ড বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলেই যে বাতিল হয়ে যায়, সেটা তো সর্ববাদী সম্মত ব্যাপার। হত্যাকান্ডের ন্যায় লোমহর্ষক অপরাধ সংগঠনের সময় নারীর যে মানসিক অবস্থা হওয়ার কথা, তাতে অপরাধের সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটাই সন্দেহজনক। এই সন্দেহের কারণেই তার সাক্ষ্য অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননা।

যেসব ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি বিরল, সেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তেমনি যেসব ক্ষেত্রে নারী ব্যতীত কোন পুরুষের প্রকৃত সত্য

www.amarboi.org

অবগত হওয়া আদৌ সম্ভব হয়না অথবা প্রায়শই সম্ভব হয়না, সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণও অনুমোদন করে। উদাহরণ স্বরূপ, সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় প্রমাণ করা। কোন মহিলা কুমারী না অকুমারী, এবং কোন যৌন ক্রটি বা দোষে আক্রান্ত কিনা, তা প্রমাণ করার জন্য নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এ ব্যাপারটা অতীত যুগের সাথেই সংশ্লিষ্ট, যখন ধাত্রীবিদ্যা, নারীদের চিকিৎসা বিদ্যা এবং নারীদের যৌন ক্রটি নারীরা ছাড়া আর কেউ জানতোনা।

সুতরাং প্রশ্নটা সম্মান ও অসম্মানের নয় এবং যোগ্যতা ও অযোগ্যতার নয়। বরং প্রশ্নটা হলো আইন বা বিধির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এবং সে সম্পর্কে বিচার ফায়সালায় সতর্কতা অবলম্বনের। যে কোন ন্যায়সংগত আইন প্রণয়নের জন্য এ নিশ্চয়তা অর্জন করা জরুরী।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই প্রশ্নে ইসলামের ওপর অভিযোগ আরোপ করা বা ইসলামকে তিরস্কার করা অর্থহীন। আমরা বুঝতে পারি যে, সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধিকে পুঁজি করে ইসলামের ওপর এই দোষারোপ করার কোনই ভিত্তি নেই যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদা দিয়েছে। কেননা ইসলাম একেবারে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্যভাবে নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত কিছু কিছু উদ্ধৃতি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

২. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

নারীকে উত্তরাধিকার দিয়ে ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ তৎকালীন জাহেলী আরব এবং বহু সংখ্যক প্রাচীন জাতি নারীর উত্তরাধিকার স্বীকার করতোনা। এমনকি বর্তমান যুগেরও কোন কোন জাতি স্ত্রীর উত্তরাধিকার স্বীকার করেনা।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী বিধিতে নারীর অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যথা ঃ

(ক) কখনো নারীর অংশ পুরুষের অংশের সমান, যেমন একই মায়ের উদরে জন্মগ্রহণকারী বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যখন আর কেউ থাকেনা এবং অনুরূপ বৈপিত্রেয় ভাই এর সাথে যখন আর কেউ থাকেনা, তখন এই ভাই ও বোন উত্তরাধিকারের এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যখন একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন থাকবে, তখন তারা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অংশীদার হবে এবং ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ।

(খ) কখনো নারীর অংশ হবে পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কম। যেমন মৃত ব্যক্তি যদি একাধিক পুত্র কন্যাসহ পিতামাতা রেখে যায়, তবে উক্ত পিতামাতা মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অতঃপর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে কয়টি অংশ অবশিষ্ট থাকবে, তা পাবে পিতা। আর যে ব্যক্তি এক কন্যা, এক স্ত্রী ও পিতামাতা রেখে মারা যাবে, তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে কন্যা। সম্পত্তিকে মোট ২৪ ভাগে ভাগ করে ১২ ভাগ কন্যাকে দিয়ে বাকী ৩ ভাগ স্ত্রীকে, ৪ ভাগ মাতাকে এবং ৫ ভাগ পিতাকে দেয়া হবে।

www.amarboi.org

(গ) সাধারণভাবে ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক। এখন প্রশ্ন এই যে, এর কারণ কী? এর কারণ কি এই যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের চাইতে অপূর্ণ মানুষ মনে করে বা তাকে মানুষই মনে করেনা? অথবা, সে কি তাকে পুরুষের ন্যায় সম্মানার্হ মনে করেনা!

না, এর কোনটাই নয়, এটা কখনই সম্ভব নয় যে, এক পর্যায়ে ইসলাম যা প্রতিষ্ঠা করবে, আরেক পর্যায়ে তা ধ্বংস করবে। সে একটা নীতি ও আদর্শ প্রবর্তন করবে, আবার পরক্ষণেই ঐ আদর্শের বিপরীত আইন রচনা করবে। আসলে ব্যাপারটা দায় ও দায়িত্ব বন্টনে ইনসাফ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলোঃ "আল্-গুরমু বিল গুনমি" অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ওপর তার প্রাপ্তি অনুপাতেই দায়িত্ব চাপানো হবে।

ইসলামী বিধিব্যবস্থায় পুরুষের ওপর যে ধরনের ও যতখানি আর্থিক দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, নারীর ওপর তেমন ন্যস্ত করা হয় না। পুরুষই স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে থাকে এবং দম্পতির বাসস্থান বাবদ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের খোরপোশ বাবদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

পক্ষান্তরে নারী মোহরানা গ্রহণ করে। সে ধনী হলেও নিজের জন্য ও নিজের সন্তানদের জন্য নিজের এক কপর্দকও ব্যয় করতে বাধ্য নয়। এ কারণেই উত্তরাধিকারে তার অংশ পুরুষের চেয়ে কম হওয়া ন্যায়সংগত। ইসলাম নারীকে সকল সাংসারিক দায়িদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি তো দিয়েছেই, উপরন্তু খোদ নারীকেও পুরুষের ওপর অতিরিক্ত দায় হিসাবে চাপিয়ে দিয়েছে এবং তারপর স্ত্রীকে পুরুষের অর্ধেক মীরাস দিয়েছে। এটা যে নারীর প্রতি ইসলামের অতি বড় উদারতা ও বদান্যতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ধরে নেয়া যাক, একব্যক্তি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে মারা গেল এবং তাদের জন্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেল। প্রচলিত নিয়মে অল্প কিছুদিন পর এই সম্পত্তির কী অবস্থা দাঁড়াবে?

মেয়েটি যে সম্পত্তি পেল, তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে এবং এক কর্পদকও হ্রাস পাবেনা। বিয়ের পর তার স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত দেনমোহর ঐ সম্পত্তির সাথে যুক্ত হবে। আর ঐ সম্পত্তিকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করলে সেখান থেকেও লাভ যুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে তার ভাই যে সম্পত্তি পেল, সে বিয়ে করার সাথে সাথে তা থেকে স্ত্রীকে মোহরানা দেয়ার কারণে তা হ্রাস পাবে। তারপর স্ত্রীর খোরপোশ ও ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি কিনতে তা আরো কমবে। এমনকি এসব করতে গিয়ে তার মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তিই ফুরিয়ে যেতে পারে। এরপরও তার ঘাড়ে সারা জীবন থেকে যাবে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব।

www.amarboi.org

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, মেয়ে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে অংশ পেল, তা তার দুর্দিনের জন্য এবং স্বামী, পিতা, ভাই বা আত্মীয়স্বজনের অভিভাবকত্ব হারানো দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে পুত্র যে অংশ পেল, তা তার অপরিহার্য আর্থিক দায়দায়িত্ব বহনে অনিবার্যভাবে খরচ হয়ে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

একবার আমার আইন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে উল্লিখিত বিবরণ দিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, এরপরও কি তোমাদের মনে হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার বন্টনে নারীর ওপর যুলুম করেছে, তার অধিকার হরণ করেছে বা তার মর্যাদা কমিয়ে দিয়েছে?

ছাত্ররা একবাক্যে জবাব দিল যে, "ইসলাম পুরুষদের প্রাপ্য কমিয়ে দিয়ে নারীর প্রতি অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়েছে।" ছাত্রীরা প্রথমে নীরব রইল। পরে তাদের কেউ কেউ স্বীকার করলো যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যথার্থ ইনসাফ করেছে।

যে সকল আইনে নারীকে উত্তরাধিকারে পুরুষের সমান অংশ দেয়া হয়, সে সকল আইনে নারীকে পুরুষের সমান আর্থিক দায়দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান সম্পত্তি দেয়া যুক্তিসংগত। কিন্তু আমরা যদি নারীকে সব রকমের আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেই, তার নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেই, এবং শুধুমাত্র পুরুষের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করি, আর তার পরও তাকে পুরুষের সমান সম্পত্তি দেই, তাহলে এটা যুক্তিসংগত কাজ হবেনা এবং কোন ন্যায়নিষ্ঠ আইনে তা গ্রহণযোগ্যও হবেনা।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইসলাম নারীর ওপর কেন অর্থোপার্জনের ও পুরুষের ন্যায় দায়িদায়িত্ব বহনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করলোনা? এর জবাব আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেব। সেখানে আমরা এই প্রশ্নে আলোচনা করবো যে, নারীর ওপর নিজের ও নিজের সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বা দায়িত্ব বহনে সহায়তা করার জন্য জীবিকা উপার্জনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা কি সমাজ ও পরিবারের জন্য বেশী কল্যাণকর হতো, না তার পরিবার ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করা বেশী কল্যাণকর?

এ পর্যায়ে আমরা নির্দ্বিধায় এ কথা বলতে পারি যে, দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সাম্য নিশ্চিত না করে উত্তরাধিকারে উভয়ের সাম্য দাবী করার কোনই অবকাশ নেই। এটি একটি পরস্পর পরিপূরক দর্শন। এটিকে আংশিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার উপায় নেই। হয় পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। আমরা যারা মুসলমান, তাদের কাছে ইসলামের দর্শনই সঠিক, অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সমাজ, পরিবার ও নারীর জন্য অধিকতর কল্যাণকর। আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করে দেখাবো যে, আধুনিক সভ্যতা অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকেও ইসলামী দৃষ্টিভংগীর যৌক্তিকতা প্রমাণিত

www.amarboi.org

হয়। যারা ভাবাবেগ ও স্বার্থমুক্ত মন নিয়ে উক্ত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করবেন, তারা এ সত্যকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

এ বিষয়টির আলোচনা সম্পন্ন করার আগে দুটো ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি ঃ

প্রথমতঃ লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলের খৃস্টানরা উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, উসমানী খেলাফত তাদের ওপরও ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি কার্যকর করতে চেয়েছিল। এতে খৃস্টানরা ক্ষেপে ওঠে। কারণ ইসলাম মেয়েকে ছেলের অর্ধাংশ উত্তরাধিকার দিয়ে থাকে। অথচ তারা মেয়েকে উত্তরাধিকার দিতে অভ্যস্ত ছিলনা। কেননা মেয়ে পিতৃগৃহ থেকে যা কিছু নেয়, তা তার স্বামীর হাতে চলে যায়। মাতরান আব্দুল্লাহ কারায়েলী প্রণীত "আইনের সারসংক্ষেপ" নামক পুস্তকের ভূমিকায় ফাদার পল্স সা'দ বলেন ঃ "১৮৪০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বিশপ যোসেফ হাব্বিশ পবিত্র ধর্ম প্রচার একাডেমির প্রধানের নিকট জারীকৃত বিধিতে বলেছেন ঃ এখন (মুসলিম) কাযীগণ পার্বত্য লেবাননে সবকিছুই ইসলামী আইন মোতাবেক পরিচালনা করছেন। এই পরিবর্তনের ফলে জেল যুলুম চলছে। বিশেষতঃ মেয়েদের উত্তরাধিকার প্রদানজনিত কারণে। কেননা ইসলামী আইনে দু'জন মেয়ে একজন ছেলের সমান উত্তরাধিকার লাভ করে। এখান থেকেই সূচনা হয়েছে দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, বিক্ষোভ ও অস্থিরতার। অতীতে এই পার্বত্য এলাকায় যে রীতি চালু ছিল, তা ছিল এই যে, ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল পরিবারের মেয়েরা পিতামাতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের কিছু জিনিসপত্র পেত। কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে পিতামাতা ওসিয়ত করলে কিছু বাড়তি জিনিসও পেত।

কিন্তু বর্তমান কাযীগণ কর্তৃক ঠিক এর বিপরীত নীতি প্রবর্তনের ফলে পিতামাতা নিদারুণ দৈহিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি ও দুশ্চিন্তার শিকার হয়েছে। কেননা পিতামাতা ইসলামী আইন মোতাবেক মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার দিয়ে ধন সম্পদ বিনষ্ট ও সংসার ধ্বংস হতে দিতে রাজী নন। তাই তারা জীবদ্দশায় এই কৌশল অবলম্বন করছে যে, ছেলেদেরকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিচ্ছে, যাতে মেয়েরা পিতামাতার মৃত্যুর পর (ইসলামী আইন অনুযায়ী) সম্পত্তির দাবীদার না হতে পারে।"

কিন্তু ছেলেদেরকে জীবিতাবস্থায় সম্পত্তি দান করায় পিতামাতার যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন উল্লিখিত বিশপ। এই ব্যাখ্যা দেয়ার পর তিনি বলেন ঃ "যেহেতু এই ব্যবস্থা (পুত্রদেরকে সম্পত্তি দান) অন্যান্য ব্যবস্থার চেয়েও ক্ষতিকর, তাই আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, মেয়ে ও স্ত্রীদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয়ার রীতি বাতিল করে আগের প্রথা পুনর্বহাল করতে হবে। অর্থাৎ মেয়েরা উত্তরাধিকার পাবেনা। বরং নির্দিষ্ট কিছু জিনিস পাবে। এতে করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমস্ত ক্ষোভ ও অশান্তির কারণ দূর হবে।" (পৃঃ১৫)

www.amarboi.org

দ্বিতীয়তঃ কতিপয় স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে এখনো পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়ের চেয়ে ছেলেকে বেশী অংশ দেয়া হয়। অথচ দায় ও দায়িত্বের বেলায় নারী ও পুরুষকে সমান গণ্য করা হয়ে থাকে।

৩. নারী হত্যার জরিমানা বা দিয়াত

যে মহিলাকে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং ভুল বশত খুন করা হয়েছে, বা যে মহিলার হত্যাকারী প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় কিসাস বা প্রাণদন্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তার জন্য শরীয়ত অর্থদন্ড তথা দিয়াতের ব্যবস্থা করেছে। এই দিয়াত হচ্ছে একই পন্থায় নিহত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।

যেহেতু ইসলাম মানবিক ব্যাপারে, কর্মের যোগ্যতায় ও সামাজিক মর্যাদায় নরনারীর সমতা নিশ্চিত করেছে, তাই দিয়াতের ক্ষেত্রে এই ব্যবধানটা দেখে খটকা লাগতে পারে। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই এই খটকা দূর হয়ে যাবে।

যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নরনারীর সাম্য নিশ্চিত করেছে, তার সাথে আলোচ্য ব্যবধানের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়টির সম্পর্ক হচ্ছে নারী বা পুরুষের নিহত হওয়ার দরুন সংশ্লিষ্ট পরিবারের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার সাথে।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডে এই পার্থক্য নেই। হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদন্ডই প্রাপ্য। এর কারণ এই যে, কিসাস বা মৃত্যুদন্ডের বেলায় আমরা প্রাণের বদলায় প্রাণ বা মানুষের বদলায় মানুষ বধ করার নীতি অনুসরণ করে থাকি। আর নারী ও পুরুষ মানুষ হিসাবে সমান। উভয়ের প্রাণ বা জীবনের মূল্য সমান।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বা অনুরূপ হত্যাকান্ডে আমাদের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, কারাদন্ড বা অনুরূপ কোন শাস্তি বিধান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। আর আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। ক্ষতিপূরণ দেয়ার বেলায় ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতেই হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখতে হবে যে, পুরুষ নিহত হলে পরিবারের যতটা ক্ষতি হয়, নারী নিহত হলেও কি ততটাই ক্ষতি হয়!

যে সন্তানদের পিতা এবং যে স্ত্রীর স্বামী অনিচ্ছাজনিত হত্যাকান্ডের শিকার হয়, তারা যে তাদের ভরণপোষণকারী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যে সন্তানদের মাতা এবং যে স্বামীর স্ত্রী অনিচ্ছাজনিত হত্যাকান্ডে মারা যায়, তারা একটা মানসিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে, যা টাকা পয়সা দিয়ে পূরণ করা যায় না।

একজন মানুষ হিসাবে নিহত ব্যক্তির মূল্য কতখানি, দিয়াত দ্বারা তা নিরূপণ করা হয়না, বরং ঐ ব্যক্তিকে হারিয়ে তার পরিবার কতখানি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো, সেইটির মূল্যায়ন করা হয়। আর এটি এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

এই বক্তব্যের সপক্ষের একটি যুক্তি এই যে, আমাদের বর্তমান প্রচলিত আইন কানুন

www.amarboi.org

দিয়াতের একটা সর্বোচ্চ সীমা ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করেছে। অতঃপর উক্ত সর্বোচ্চ সীমার উর্ধে না হয় ও সর্বনিম্ন সীমার নীচে না হয়, দিয়াতের এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণের ভার বিচারকের ওপর অর্পণ করেছে। সংশ্লিষ্ট পরিবার নিহত ব্যক্তিকে হারিয়ে কতখানি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো, তা নিরূপণের জন্য ব্যাপকতর অবকাশ সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। কর্মজীবী মানুষের অনেকের মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতির বিপুল পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্মজীবীও আবার নিজ পরিবারের ভরণ পোষণের দায়দায়িত্বও বহন করে, তার সাথে ঐ ব্যক্তির ব্যবধান না হয়ে পারে কেমন করে যে, কর্মজীবীও নয় এবং কারো ভরণপোষণের দায়িত্বও বহন করেনা!

বিষয়টি আমি এভাবেও ব্যক্ত করতে চাই যে, সমাজ ও পরিবারের কল্যাণের স্বার্থে নারীকে তার নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার যে দর্শন ইসলাম পেশ করেছে, এ জিনিসটি তার সাথেও সংগতিপূর্ণ। তবে যে সকল সমাজে নারীকে নিজের ভরণ পোষণের জন্য জীবিকা উপার্জনের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দেয়ার দর্শন চালু রয়েছে এবং কার্যত নারী তার পরিবার ও সন্তানদের ভরণ পোষণে অবদান রাখে, সেই সমাজে এরূপ কোন কর্মজীবী নারী যখন খুন হবে, তখন ন্যায়বিচারের দাবী অনুযায়ী তার দিয়াত নিহত পুরুষের দিয়াতের সমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৪. রাষ্ট্র প্রধানের পদ

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা তথা প্রেসিডেন্টের পদটি পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হওয়াকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "নিজেদের শাসন ক্ষমতা কোন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে এমন জাতির ভালাই নেই।" এ হাদীসে যে শাসন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা কেবলমাত্র সর্বোচ্চ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের পদটাই বুঝানো হয়েছে। কেননা রাসূল (সা) এই কথাটা তখনই বলেছিলেন, যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পারস্যের সম্রাটের মৃত্যুর পর পারস্যবাসী তাঁর এক কন্যাকে দেশের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। তা ছাড়া নারী কোন পর্যায়েই কোন শাসন ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে না এই মর্মে কোন সর্বসম্মত বিধান ইসলামী আইনে নেই। কেননা নারীকে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের তত্ত্বাবধায়িকা নিয়োগ করা যায় এবং সীমিত পর্যায়ে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ক্ষেত-খামার পরিচালানার কাজের পরিচালিকা নিযুক্ত করা যায়, সে ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণ একমত। তাছাড়া সাক্ষ্য দেয়া তো নারীর জন্য বৈধ আছেই, আর ইসলামী আইনবিদদের মতে সাক্ষ্য দেয়ার কাজটি একটি প্রশাসনিক কাজ বিশেষ। ইমাম আবু হানিফার মতে, ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে বিচারকের পদেও নিযুক্ত করা বৈধ। এই বিচারকের পদটি একটি প্রশাসনিক পদ বিশেষ।

সুতরাং হাদীসটির ভাষা নারীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে বলে প্রতীয়মান হয়। আর গুরুদায়িত্বের দিক থেকে যে

www.amarboi.org

পদ সর্বোচ্চ শাসকের পদের অনুরূপ, সেটিও একইভাবে নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য পদে নিযুক্তির বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

রাষ্ট্রপ্রধান তথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহীর পদটি যে নারীর জন্য নিষিদ্ধ এটিও তার মানবিকতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামের বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী নয়। শুধু জনকল্যাণ, নারীর মনস্তাত্বিক অবস্থা ও তার সামাজিক দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই এ বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি কেবল শোভাবর্ধনমূলক ও দস্তখত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রতীকী পদ নয়। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে সমাজ ও জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক, তার প্রধান চিন্তানায়ক, তার সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব ও তার মুখপাত্র। তার অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষমতা রয়েছে। যথা ঃ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, লড়াই-এর ময়দানে মুসলিম উম্মাহর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের ভূমিকা পালন করা এবং স্বার্থের অনুকূল হলে সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নচেত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রদান। স্বভাবতই এসব কাজ উম্মাহর সর্বোচ্চ প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমেই সম্পন্ন হবে। কেননা স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে যে, "দায়িত্ব পালনে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" তবে রাষ্ট্রপ্রধানকেই এই পরামর্শের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয় এবং পরামর্শদাতারা মতবিরোধে লিপ্ত হলে কাদের মত তার নিকট অগ্রগণ্য তা স্থির করতে হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ "তুমি যখন কোন মত স্থির করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর।"

অবসর পেলে জুময়ার জামায়াতে খুৎবা দান, নামাযের ইমামতি করা, এবং মানুষের বিরোধ মীমাংসা করাও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের আওতাভুক্ত হবে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, বিশেষত যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব, নারীর মানসিক ও স্নায়ুবিক গঠন প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা এগুলোর জন্য প্রয়োজন স্নায়ুবিক দৃঢ়তা, আবেগের ওপর বুদ্ধির প্রাধান্য এবং সংঘাত সংঘর্ষে ও রক্তপাত দর্শনের সাহস ও বিক্রম। নারীর মধ্যে যে এসব যোগ্যতা নেই সেজন্য আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা। কেননা তা যদি থাকতো তবে মানব জীবন তার দয়া, মমতা ও কোমলতার ন্যায় সুন্দরতম উপাদানগুলো হারিয়ে ফেলতো।

এছাড়া আর যেসব কথা বলা হয়, তা স্পষ্টতই একগুঁয়েমি ছাড়া কিছু নয়। এ কথা সত্য যে, ইতিহাসে এমন কিছু মহিলারও সাক্ষাত পাওয়া যায় যারা সৈন্য পরিচালনা করেছে ও যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এগুলো বিরল ঘটনা। এগুলো দেখে নারীর শাশ্বত কোমল প্রকৃতির কথা ভুলে যাওয়া যায়না, যা ইতিহাসের সকল যুগে ও সকল জাতিতে বিদ্যমান ছিল। এমনকি আজকের এ যুগেও আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোন জাতির সাক্ষাত পাইনি, যা নারীকে জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিতে গিয়ে এতটা উগ্রতা প্রদর্শন করেছে যে, কোন মহিলাকে তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এমনকি কোন ক্ষুদ্র সেনাদলের অধিনায়ক পর্যন্ত করতে সম্মত হয়েছে।

www.amarboi.org

আর এসব পদ বা ক্ষমতা না পেয়ে, নারীর যে কোন ক্ষতি হয়ে গেছে তাও নয়। কেননা মানব জীবন সব সময় কেবল নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও শক্তি প্রদর্শনের ধারা অনুসরণ করে চলেনা। তা যদি চলতো, তাহলে পৃথিবী এক অসহনীয় নরকে পরিণত হতো। এটা আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি পুরুষের তেজস্বিতা ও দৃপ্ততাকে নারীর কোমলতা ও মমত্বের সাথে, পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও রুক্ষতাকে নারীর সদাশয়তা ও হৃদ্যতার সাথে এবং পুরুষের কঠোরতাকে নারীর নম্রতার সাথে সমন্বিত করেছেন। বস্তুত নারীর স্নেহ মমতা দয়াশীলতা ও নারীত্বেই নিহিত রয়েছে নরনারী নির্বিশেষে গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব, স্থিতি ও সুখ সমৃদ্ধির মূল রহস্য।

জুময়ার খুতবা দান ও নামাযের ইমামতি প্রসংগে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইবাদাত উপাসনার কাজটি সকল ধর্মেই বিশেষত ইসলামে গভীর একাগ্রতা দাবী করে। ইবাদাতের সময় মন যাবতীয় কুচিন্তা থেকে মুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু নারী যদি পুরুষদের নামাযের ইমামতি করতো বা খুতবার মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিত, তবে পুরুষদের এই একাগ্রতা ও মনের পবিত্রতা অর্জন করা নিশ্চিত হতো না।

তবে আমার মতে, আসল কারণটি খুতবা, ইমামতি বা সমস্যার সমাধান নয়। আসল কারণটি হলো ভাবাবেগমুক্ত মন, জনকল্যাণকে ঝোক ও আবেগের উর্দ্ধে স্থান দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য মনের একাগ্রতা-যা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য, অথচ কোন মহিলার মধ্যে এইসব গুণ থাকা স্বাভাবিক নয়।

সারকথা

সারকথা এই যে, নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য, তার যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়ার পর ইসলাম তার স্বভাব প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং তার এই স্বভাদপ্রকৃতি জীবনের কোন্ কোন্ কাজ বা কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত, তা নির্ণয় করেছে। অতঃপর যে যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার উক্ত স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী ও অনুপযোগী, কিংবা সমাজে তার স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়, সেই সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে। এ কারণেই পুরুষের তুলনায় তার ওপর কিছু কিছু কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আবার কিছু কিছু দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। একই উদ্দেশ্যে তার ওপর থেকে জুময়ার নামায, হজ্জে এহরাম বাঁধার বাধ্যবাধকতা এবং সর্ব সাধারণকে যখন যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন ব্যতীত যুদ্ধে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। আর এসব জিনিসের মধ্যে একটিও এমন নেই, যা পুরুষের সাথে মানবিকতা, যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদায় নারীর সাম্যকে ক্ষুণ্ন করে। আর এটা শুধু ইসলামী আইনের একক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং দুনিয়ার সকল জাতিতে ও সকল যুগে কিছু কিছু আইন ও বিধি কিছু কিছু নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ নির্দিষ্ট করণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোন বিশেষ স্বার্থ ও কল্যাণ সাধন— নাগরিকদের মধ্যে যোগ্যতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা নয়।

www.amarboi.org

কয়েকটি অকাট্য সত্য

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বব্যাপী আলোচনায় নারী সম্পর্কে ইসলামের যে নীতি ও অবস্থান জানা গেল এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তার ঘোষিত যে নীতিমালা পরিস্ফুট হলো, তা থেকে আমরা নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি অকাট্য সত্যের সন্ধান পেতে পারি ঃ

প্রথমতঃ নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও অবস্থান প্রকৃতপক্ষে সমকালীন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে এবং তৎপূর্ববর্তী যুগের চিন্তাধারা ও মানসিকতার আলোকে একটি পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক বিপ্লব ছিল। কেননা সে আমলে নারী আদৌ মানুষ কিনা তা নিয়েই সন্দেহ পোষণ করা হতো।

দ্বিতীয়তঃ তা সেই সব প্রাচীন ও আদিম চিন্তাবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং এ যুগেরও কিছু কিছু প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সেই সব ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব, যাতে নারীকে ধর্ম পালনের ও সৎ মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ তা নারীকে যথার্থ মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি সহকারে শ্রদ্ধা জানাতে প্রচলিত মত পথ ও ঐতিহ্যের ধারক বাহকরা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও এক জোরদার প্রতিবাদ।

চতুর্থতঃ তা ছিল মানব জাতি কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতারও আগে অর্জিত এক নজীরবিহীন চিন্তাগত অগ্রগতি। আধুনিক সভ্যতারও অন্তত ১২শ বছর আগে ইসলাম নারীর স্বাভাবিক যোগ্যতা ও পরিপক্কতার স্বীকৃতি প্রদান করে এই চিন্তাগত অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছিল।

এ প্রসংগে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসলামী আইনে কোন মানুষকে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা উন্মাদ হওয়া ব্যতীত আর কোন কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম, চাকুরী, দায়দায়িত্ব, লেনদেন, সম্পত্তির ভোগদখল, মালিকানা লাভ ও হস্তান্তর, ক্রয়বিক্রয়, ভোটদান ইত্যাদি অযোগ্য ঘোষণা করেনা। অথচ রোমান আইনে (যা পাশ্চাত্য আইনের প্রধান ভিত্তি) ও ফরাসী আইনে ১৯৩৮ সাল পর্যন্তও যাবতীয় সামাজিক অধিকার থেকে উন্মাদ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও নারী - এই তিন ধরনের মানুষকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে যখন ফরাসী আইনের সংস্কার সাধিত হলো এবং নারীর সামাজিক যোগ্যতা ও অধিকারের ওপর থেকে বিধিনিষেধ রহিত করা হলো, তখনো তাকে আইনসম্মত বিধিনিষেধের অধীন রাখা হয় এবং তাকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তিতে ভোগদখল ও তত্ত্বাবধানের অধিকার দেয়া হয়। আইনসম্মত বিধিনিষেধের মধ্যে একটি ছিল এই যে, সে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন চাকুরী করতে পারবেনা।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পদের ভোগদখল সংক্রান্ত বিধিতে ঘোষণা করা হয় যে, ফরাসী নারী নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এককভাবে ভোগদখল করতে পারবেনা, বরং তাতে তার স্বামীর ভোগের অধিকার সংরক্ষণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার

www.amarboi.org

নিজের ব্যাপারেও সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। এমনকি এ ব্যাপারে আদালতের অনুমতিও যথেষ্ট নয়। (আয্-যিওয়াজ, জুহদী একান ঃ ২২৪)

ফরাসী নারীর সামাজিক অধিকারের ওপর আরোপিত এইসব কড়াকড়িকে যখন মুসলিম নারীর সেই পূর্ণাংগ সামাজিক যোগ্যতা ও অধিকারের সাথে তুলনা করা হয়, যা সে চৌদ্দশো বছর ধরে ভোগ করে আসছে এবং যার সাথে ফরাসী নারীর সীমিত অধিকারের কোনই সাদৃশ্য নেই, তখন বুঝা যায় যে, ইসলাম সমগ্র মানবেতিহাসে নারীর অধিকার ও যোগ্যতা সংক্রান্ত আইন রচনায় অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার তুলনায় কিরূপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ দ্বারা এও উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, আজও পর্যন্ত ফরাসী নারীর পরিপূর্ণ আইনগত অধিকার পুনর্বহাল না হওয়ায় ফরাসী আইনজ্ঞরা কেন এত মর্মাহত। সাবেক ফরাসী আইনমন্ত্রী "রনোম্ভের" এই খেদোক্তি কত মর্মস্পর্শী যে, "ফরাসী নারীর আশা-আকাংখা ও স্বপ্ন আজও অপূর্ণই রয়ে গেল!" (আয্-যিওয়াজ; যুহদী একান, ২২৬ পৃঃ)

পঞ্চমতঃ ইসলামী আইন যখন নারীর এইসব অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তখন নারীদের এজন্য কোন আন্দোলন, বিপ্লব ও সভা-সমিতি করতে হয়নি, বরং ইসলাম মানবীয় আবেগ অনুভূতি ও ন্যায়নীতির তাকিদে স্বতস্ফূর্তভাবেই এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এর স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ ফরাসী নারী অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং অনেক সভাসমিতি, আন্দোলন ও ধর্মঘট ইত্যাদি করার পরেই পর্যায়ক্রমে ও কিস্তিতে কিস্তিতে এসব অধিকার আদায় করেছে, যা কিনা ইসলাম তাকে দিয়েছে একসাথে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বেচ্ছায় ও স্বউদ্যোগে।

ষষ্ঠতঃ ইসলামী আইন যখন নারীকে এ সকল অধিকার দিয়েছে, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ ও পরিচ্ছন্ন। হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্তাবকতা ও তোষামুদী এবং নারীত্বকে শোষণ করার নোংরা মানসিকতা তার ছিলনা। অথচ গ্রীক, রোমান ও আধুনিক সভ্যতায় তাকে বল্গাহীনভাবে যত্রতত্র বিচরণ ও অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলির অনুমতি দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তার নারীত্বকে উপভোগ করা - তার অধিকার ও মর্যদার প্রতি স্বীকৃতি দেয়া নয়। কেননা এ সকল সভ্যতার কাছে নারীর অধিকার ও তার আইনগত যোগ্যতার সপক্ষে এগুলিই ছিল একমাত্র যুক্তি!

পক্ষান্তরে ইসলাম পালন করেছে ঠিক এর বিপরীত ভূমিকা। নারীর জন্য সে শুধু সেই বিধানই দিয়েছে, যা আইনগত ও আর্থিক দিক দিয়ে তার যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম। পুরুষের সাথে তার মেলামেশা ও সভা-সমিতিতে তার বিচরণের ওপর সে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। কেননা সে চায় পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে, সে চায় নারীর ইজ্জত সম্ভ্রমকে নিরাপদ ও তার নারীত্বকে শোষণমুক্ত করতে।

সপ্তমতঃ ইসলামী আইন নারীকে শুধু তার অধিকার দিয়ে ও তার সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং যে কাজেই ও যে ধরনের আচরণেই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা

www.amarboi.org

যাতে তার স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও মানানসই হয়, এবং তার জন্য কঠিন ও অস্বাভাবিক না হয়, সেটা নিশ্চিত করেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্রয়বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেনের ব্যাপারে নারীকে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে এবং এসব কাজের জন্য তার পরিপূর্ণ যোগ্যতার স্বীকৃতিও দিয়েছে। তবে সে তাকে এই মর্মে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে যে, সে যেন একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এসব যোগ্যতা ও অধিকার প্রয়োগ না করে। ইসলাম নারীকে বুঝিয়েছে যে, তার নিজের, তার পরিবারের ও তার সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে তার উচিত গৃহস্থালী সংক্রান্ত কাজ ও দায়িত্বকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ ও পালন করা। বস্তুত এ কাজ বাইরের কাজ ও দায়িত্বের তুলনায় সহজতর বা কম কষ্টকর নয়। তবে বাইরের কাজের চেয়ে অধিক সম্মানজনক ও মর্যাদাকর। জীবিকা উপার্জনের জন্য নারীর বাইরে শ্রম দেয়ার চাইতে গৃহস্থালীর কাজে আত্মনিয়োগ করা তার মানবিক মর্যাদাকেও আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি যে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী ধর্মমত ও আইনের মত ইসলাম গৃহবহির্ভূত কাজ তার জন্য নিষিদ্ধও করেনি, আবার তাকে এজন্য উৎসাহিতও করেনি যে, বাড়ীঘর ও পরিবারের কল্যাণের তোয়াক্কা না করে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যত খুশী কাজ করুক - যেমনটি আধুনিক সভ্যতায় চলছে। বস্তুত এমন প্রাজ্ঞবিধান যে একমাত্র মহাকুশলী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর রচিত বিধানই হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অষ্টমতঃ উপরোক্ত সব কয়টি সত্যের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিস্বরূপ মুসলিম নারী বিশ্বের সকল নারীর সামনে এজন্য গর্ব বোধ করতে পারে যে, তার অনুসৃত ইসলামী আইন ও সভ্যতা দুনিয়ার অন্য সমস্ত আইন ও সভ্যতার তুলনায় তাকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সবচেয়ে আগে ও সবচেয়ে নিঃস্বার্থভাবে তার অধিকার প্রদান করেছে এবং তার মানবোচিত মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই অধিকার ও মর্যাদা দিতে গিয়ে সে তার নারীত্বের বিন্দুমাত্রও অবমাননা করেনি, তার মনুষ্যত্বকে কিছুমাত্র খাটো করেনি এবং কোন স্বার্থের কালিমাও তাকে স্পর্শ করেনি।

www.amarboi.org

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মুসলিম নারীর অবস্থা

(ক) উত্থান যুগে

ইসলামের বিঘোষিত এই সর্বাত্মক ও মৌলিক সংস্কারকামী নীতিমালার আলোকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে নারী পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকারসম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়, যেখানে নারী স্ত্রী হিসাবে এবং সর্বজনমান্য মানুষ প্রস্তুতকারী মহীয়সী জননী হিসাবে সমাজের কাছ থেকে যথার্থ মর্যাদা ও সমাদর লাভ করে এবং যেখানে পরপুরুষের সাথে অবাধ ও সন্দেহজনক মেলামেশার সুযোগ না থাকায় নারীকে অপবাদ, অপমান ও কলংকের বোঝা বইতে হয়না। সে সমাজে একমাত্র ইবাদাতের স্থানসমূহে, জ্ঞান চর্চার মজলিস ও অনুষ্ঠান সমূহে এবং যুদ্ধের ময়দানসমূহে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য নারী ও পুরুষের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব স্থানেও নারীদের জন্য পৃথক বৈঠক, গাম্ভীর্যপূর্ণ পোশাক ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজমান থাকায় কোন লোলুপ চাহনি তাদেরকে বিব্রত করেনা, কিংবা কারো অসংযত আচরণ তাদেরকে পীড়া দেয়না। সেখানে কোন নারী যখন পুরুষদের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তখন পুরুষরা লজ্জার তাকিদে চোখ ফিরিয়ে নেয়, কোন নারী যখন কোথাও আসন গ্রহণ করে, তখন পুরুষরা তার কাছ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং কোন নারী যখন রণাংগনে যুদ্ধ করে, তখন তার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়।

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের নারী সংক্রান্ত নীতিমালায় মযহাবী মতভেদ যতই প্রতিফলিত হোক, তার মূল রূপ সর্বযুগে একই রকম থেকেছে। কেননা আল্লাহর কিতাবে, রাসূলের হাদীসে এবং রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের বাস্তব অনুশীলনে ও কর্মধারায় এই নীতিমালা সর্বদাই স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(খ) পতন যুগে

এরপর ক্রমাগত মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ এবং মুসলিম দেশসমূহের রীতিনীতি ও আচার আচরণের বিবর্তন ঘটতে থাকায় নারীকে রকমারি যুগ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো তার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত হয়, আবার কখনো তা হয় অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার। সর্বশেষে নারী এমন এক পতনের যুগে পদার্পণ করে যখন তার অধিকার ও মর্যাদা অনেকাংশে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সে চরম অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়। ফলে ইসলাম নারীর ওপর যে সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিল, তা পালনে সে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়ে।

এতদসত্ত্বেও আমরা ইতিহাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, এই তমসাচ্ছন্ন যুগেও দুইটি জিনিস অবিকৃতভাবে বহাল ছিল ঃ

www.amarboi.org

প্রথমতঃ ইসলাম নারীর যে অধিকারসমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছিল, তা মুসলিম ফকীহদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে অবিকৃতভাবে বহাল ছিল, যদিও সমকালীন সমাজ তার বেশীর ভাগকেই কার্যকরী রাখতে সক্ষম হয়নি। এর কারণ এই যে, মুসলিম নারী ইসলামী সমাজে যে অধিকারগুলো পেয়েছে ও ভোগ করেছে, তা কোন আকস্মিকভাবে উদ্ভূত সামাজিক জরুরী পরিস্থিতির তাকিদে দেয়া অধিকার ছিলনা, যে স্বাভাবিক অবস্থা বহাল হওয়ার পর বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারবে। বরং এগুলি ছিল স্বয়ং আল্লাহর শাশ্বত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার, যাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করার অধিকার ও ক্ষমতা কারো ছিলনা, তা সে যত উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই হোক না কেন।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম নারীর সতিত্ব ও সচ্চরিত্রতার সুনাম এবং তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অভ্যাস এই পতনের যুগেও অটুট ও অক্ষুণ্ন ছিল। পতন যুগে মুসলিম সমাজ যত বিকৃতি, অধোপতন ও নৈরাজ্যেরই শিকার হোক না কেন, তার নারী সমাজের এ উজ্জ্বল বৈশিষ্টটি কখনো কালিমালিপ্ত হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট মুসলিম নারীকে পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করেছে। এর কারণে তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সূচনাকাল থেকেই মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ রাখা ও তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করা শুরু করেছে।

বস্তুত এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম দেশগুলোতে কর্মরত অমুসলিম সংযোগ মাধ্যমগুলো মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিতে নারীর সতিত্ব সুরক্ষা ও তার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকাকে মুসলিম নারীর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতির কারণ বলে মেনে নিয়েছে, যা থেকে পাশ্চাত্যের নারী বঞ্চিত। অথচ এই উভয় নারী (মুসলিম নারী ও পাশ্চাত্যের খৃস্টান নারী) একই ধর্মের (অর্থাৎ ওহীযোগে প্রাপ্ত ধর্মের) অনুসারী। এ কারণেই আমরা আজও সম্ভ্রান্ত খৃস্টান পরিবারসমূহে নারীর সতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মানসিকতা দেখতে পাই - যদিও তাদের ও আমাদের ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও রীতিনীতিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

www.amarboi.org

নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়েজনীয়তা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

চলতি শতাব্দীর শুরুতেই যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিম বিশ্বের যোগসূত্র স্থাপিত হলো, তখন আমাদের সামাজের নারীদের সমস্যা সমাধানে সমাজ সংস্কারকদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। কেননা যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত অধপতন, অবহেলা ও অধিকারহীনতা আমাদের নারী সমাজকে তখন চরম দুর্দশায় নিপতিত করে রেখেছিল। ফলে আমাদের সমাজের উন্নয়নে ও জাতীয় উত্থানে তাদের আর কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের অবকাশ ছিলনা।

সংস্কারের দুইটি পন্থা

সংস্কারকামীদের অধিকাংশই দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগী পোষণ করতো ঃ

১. যারা ইসলামকে জানতেন, ইসলামে নারী জাতিকে যে উচ্চ মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন, এবং মুসলিম নারী হিসাবে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তারা মুসলিম জনগণকে ইসলামের উত্তরাধিকার দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং নারীর উন্নয়ন ও সংস্কারে বিভিন্ন জাতি যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানালেন।

২. পাশ্চাত্যে চোখ ধাঁধানো নগর সভ্যতায় যাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের চালচলন ও জীবনধারায় যারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তারা স্বজাতিকে এই বলে আহবান জানাতে লাগলো যে, আমাদের সমাজের নারীদেরকে উন্নতি ও প্রগতি অর্জন করতে হলে পাশ্চাত্যের রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং তাদেরকে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সংস্কারকরা এই দু'টি দৃষ্টিভংগীর অনুসারী হয়ে দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমি সেই তৃতীয় শিবিরটির উল্লেখ করছিনা, যারা নারীদের বিরাজমান পরিস্থিতিকে পুরোপুরি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিল এবং তাদের জীবনে আদৌ আর কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করতোনা। এদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করবেনা। কেননা আমি তাদেরকে বাস্তবতাবাদী মনে করিনা। যুগ যুগ ধরে অধপতন ও পশ্চাদমুখিতার ফলে নারী সমাজ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিল, তা অব্যাহত থাকার সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তারা উপলব্ধি করেন বলে আমার মনে হয়না।

নারীর অবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে উল্লেখিত দু'টি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগীর প্রতিফল যে আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রীয় আইন কানুনে পড়বে, সেটা এক রকম অনিবার্য ছিল বলা যায়।

www.amarboi.org

তাই দেখা যায়, প্রচলিত আইন কানুনে কোথাও নারীদের ব্যাপারে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে বিধিসমূহ হুবহু প্রযুক্ত হয়েছে। আবার কোথাও বা দেখা যায়, ঠিক তার বিপরীত বিধি রচিত হয়েছে। আমি যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, এই সকল বিধির পর্যালোচনা করবো।

সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ

আমাদের মুসলিম দেশগুলোর আইনকানুনে নারী জাতির উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে যেসব পরিবর্তন সাধিত ও বিধিসমূহ রচিত হয়েছে, তাকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

(ক) ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ
(খ) রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ
(গ) সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ

নারীর ব্যক্তিগত অধিকার

এ কথা সুবিদিত যে, আমাদের পারিবারিক নিয়ম বিধি সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিশর ও ইরাকে শত শত বছর ধরে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে। আর লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে মালেকী মাযহাব থেকে, হেজাজ ও অন্য কয়েকটি দেশে শাফেয়ী মাযহাব থেকে এবং সৌদী আরব, কুয়েত ও আরব আমীরাতে হাম্বলী মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে।

জনগণ কখনো কোন বিতর্কে লিপ্ত হলে শরীয়তের বিশেষজ্ঞ কোন ফকীহ বা মুফতীর কাছে যেত এবং সেই ফকীহ বা মুফতী নিজ অনুসৃত মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তি করতেন।

এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক মাযহাবেই এমন কিছু বিধি চালু আছে, যা পরিবারের স্বার্থের সহায়ক নয়। বিশেষতঃ সভ্যতা, সামাজিক রীতি প্রথা ও ঐতিহ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে সেগুলো অনেকাংশে বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে। এজন্য তুরস্কের উসমানী খিলাফাত নিজ শাসনামলের শেষের দিকে পরিবার সংক্রান্ত কিছু ইসলামী বিধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সূচনা করে। ১৩৩৬ হিঃ সনে হানাফী মাযহাবের কিছু অভিমত এবং অন্যান্য মাযহাবের কিছু অভিমতের সমন্বয়ে 'পারিবারিক অধিকার আইন' জারী করে। অনুরূপভাবে মিশর ও হানাফী মাযহাব বহির্ভূত কিছু সিদ্ধান্ত ও মতামতের ভিত্তিতে নতুন পারিবারিক আইন চালু করার উদ্যোগ নেয়।

১৯৫১ সালে সিরিয়াতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পারিবারিক আইন জারী করা হয়। এতে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের মতামত গ্রহণ করা হয়। এ আইনের শেষ ধারায় বলা আছে যে, যে ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে আইনের কোন ধারা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করা হবে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে জর্ডান, তিউনিস, মরক্কো ও ইরাকে প্রচলিত মাযহাবসমূহের মতামতের সমন্বয়ে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে। তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসহ এই দেশগুলিতে প্রধানত পারিবারিক আইনের কোন কোন বিধি সরাসরি শরীয়তের বিরোধী।

আরব দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে প্রচলিত পারিবারিক আইনসমূহের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সব দেশে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য ও তদনুসারে আদালত পরিচালিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে যে ক্ষোভ স্তূপীভূত ছিল, তা নয়া আইন চালু হওয়ায় অনেকাংশে দূর হয়েছে। বস্তুতঃ একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে, এরূপ চিন্তাধারা শরীয়ত দ্বারাও সমর্থিত নয়, আর তা জনস্বার্থেরও অনুকূল নয়।

আমার এ আলোচনাকে আমি সিরীয় ও মিশরীয় পারিবারিক আইন সংস্কারের পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। কেননা অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশেও সম্ভবতঃ অনুরূপ সংস্কারই সম্পন্ন হয়েছে।

১. বিবাহ বিধির সংস্কার

বিবাহ বিধি সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বপ্রথমেই আসে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের প্রসংগ।

(ক) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ ইসলামের প্রধান প্রধান চারটি মাযহাবের ও অন্যান্য ছোটখাট মাযহাবের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা যৌবনে পদার্পণ করেনি এমন বালক বালিকার বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ। এই মতের স্বপক্ষে তারা আল কোরআনের বহু সংখ্যক উক্তির আলোকে কৃত ইজতিহাদ, রাসূল (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগে সংঘঠিত ঘটনাবলীকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন।

তবে ইবনে শাবরুমা প্রমুখ মুষ্টিমেয় সংখ্যক ফকীহ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ সর্বতোভাবে অশুদ্ধ ও অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের মতে, এই সকল বালক বালিকার অভিভাবকগণ তাদের পক্ষে যে বিয়ে সম্পন্ন করেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল এবং তার আদৌ কোন কার্যকারিতা নেই।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, যে কল্যাণ, সার্থকতা, উপকারিতা ও যৌক্তিকতার আলোকে ইসলামী আইনে বিয়ের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, তা এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থক। এই বিয়েতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কোনই কল্যাণ, বা উপকারিতা ও সার্থকতা নেই। বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে এতে ষোল আনাই ক্ষতি ও অপকারিতা নিহিত রয়েছে কেননা যৌবনে পদার্পণের পর প্রত্যেক যুবক ও যুবতী এমন এক ব্যক্তিকে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর আসনে আসীন দেখতে পায় এবং তাকে স্বামী বা স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যে তার জীবনে তার সম্পূর্ণ বিনা ইচ্ছাতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাকে স্বামী বা স্ত্রীরূপে সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি এবং তাকে তার স্বামী বা স্ত্রী বানানোর সময় কেউ তার মতামতও

www.amarboi.org

গ্রহণ করেনি। তার সাথে তার স্বভাবে, চরিত্রে ও মনমেজাজে মিল নাও থাকতে পারে। দু'জনের একজন চরিত্রহীনও হতে পারে। এমন আরো অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটতে পারে এবং অহররই ঘটে থাকে।

এ ধরনের বিয়ে শাদীতে, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে তা হলো পারিবারিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে দুটি পরিবারকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ। অনেক ক্ষেত্রে এই দুই পরিবারের অভিভাবকদ্বয় সম্পর্কে পরস্পরের ভাই বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়ে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বার্থের কোন গুরুত্ব নেই, আজকের সমাজ জীবনে দাম্পত্য সুখের জন্যও এ ধরনের দৃষ্টিভংগীর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ক্ষেত্রে বরঞ্চ অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভবিষ্যতে অবনিবনা হয়ে সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটে যায়।

আমাদের সমাজে প্রাচীনকাল থেকে এই ঐতিহ্য চলে আসছে যে, যুবতী কন্যার স্বামীনির্বাচনের কোন অধিকার নেই, বরং পিতা বা মাতা বা উভয়ে মিলে যার সাথে ভালো মনে করে, কন্যার বিয়ে দিয়ে দেয়। এই ঐতিহ্য চালু থাকায় পিতামাতার পক্ষে কন্যাকে বাল্যকালে বিয়ে দেয়া আরো সহজ কাজ বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে বড় হয়ে সে নিজেকে পিতামাতার মনোনীত স্বামীর স্ত্রী হিসাবে দেখতে পায় এবং বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাদপ্রতিবাদ করতে গেলে স্ত্রী অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। এমনকি সে যদি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, তা হলে তার খুন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই বিষয়টি শরীয়ত অনুমোদন করেনা। পারিবারিক ও সামাজিক স্বার্থের দোহাই দিয়েও এরূপ কাজ করার যুক্তি নেই। এতে বরঞ্চ যুবক ও যুবতীর দাম্পত্য সাথী বাছাই করার অধিকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়। অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা গেছে যে, এ ধরনের বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল তো হয়ইনা, এমনকি বহু ক্ষেত্রে ভয়ংকর নৈতিক পদস্খলন ও হিংসাত্মক অপরাধের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

এই প্রেক্ষাপটেই সিরীয় পারিবারিক আইন রহিত হয়েছে এবং তাতে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের বিয়ে যদি সংঘটিত হয়েও যায়, তবে আইনের চোখে তা অবৈধ ও অচল। এ আইন উসমানী খিলাফতের আইনের অনুসরণেই রচিত হয়েছে। অবশ্য মিশরীয় আইনে এখনো এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়নি। কেননা গ্রামাঞ্চলে যেখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন এত বেশী যে, রাতারাতি এই প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তবে একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেটি হলো কোন মিশরীয় আদালতে বাল্যবিবাহ রেজিস্ট্রী হতে পারবেনা। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকার দাম্পত্য সম্পর্ক আদালতের আওতাবহির্ভূত থাকবে। এতে করে বিয়ে অবৈধ ঘোষিত না হলেও বাল্যবিবাহ উচ্ছেদের এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ।

www.amarboi.org

তবে আমি মনে করি, সিরীয়াতে যে আইন চালু আছে, তা সবচেয়ে উত্তম।

(খ) বিয়ের বয়স নির্ধারণঃ ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রে তথা ইসলামী আইনে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই, অন্য কথায় বিয়ের বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। বরং এর সাধারণ নির্দেশাবলীর মূলকথা এই যে, যৌবনে পদার্পণ করাই একজন মানুষের সাবালক বা সাবালিকা হওয়া ও সকল কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যৌবনে পদার্পণের নিশ্চয়তা লাভের জন্য মোটামুটি ভাবে ২৫ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব মুসলিম দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন চালু আছে, তাতে সাধারণত পুরুষের জন্য আঠারো ও নারীর জন্য সতেরো বছরকে যৌবন প্রাপ্তির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনে ১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ ও ১৭ বছর বয়স্কা নারীকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে আদালতে গিয়ে বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানাতে পারবে। আদালত যখন নিশ্চিত হবে যে, আবেদনকারী বা আবেদনকারীনী দৈহিকভাবে বিবাহযোগ্য এবং তার পিতা বা দাদা তাতে সম্মত, কেবল তখনই আদালত তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবে।

বিয়ের বয়সের এই কড়াকড়ির পক্ষে কোন মুসলিম ফিকাহ্ শাস্ত্রকারের সমর্থন নেই। এটা পাশ্চাত্য আইন থেকে গৃহীত। পাশ্চাত্যবাসীর একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট আছে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক নরনারী যে ঠিক এই বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, তা আমার মনে হয়না। আমাদের সমাজের সাধারণ নৈতিক পরিবেশও এই বয়সের সীমা নির্ধারণের অনুকূল নয়। যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথেই নরনারীর বিয়ে করার অধিকার ও অনুমতি থাকা অপরিহার্য। এটা যুবক-যুবতী স্বয়ং এবং তাদের অভিভাবকগণই ভালো বুঝবে যে, যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করা কল্যাণকর, না আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে আইন আদালতের হস্তক্ষেপের কোন অর্থ হয় না। যৌবনে পদার্পণ করার সংগে সংগেই যেখানে শরীয়ত বিয়ের অনুমতি দেয়, সেখানে যুবক-যুবতীর শারীরিক সামর্থ্য সম্পর্কে আদালতের সম্মতি ও সার্টিফিকেট না পেয়ে বিয়ে করা যাবে না, এর কোন যুক্তি থাকতে পারেনা। আদালত কি যুবক-যুবতী বা তাদের অভিভাবকের চেয়ে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে বেশী সচেতন?

এ ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের কোন ফায়দা আছে বলেও আমার মনে হয়না। কেননা যে পিতামাতা তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তারা এ জন্য হাজারো রকমের ফন্দির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে বয়সের এই কড়াকড়ি একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়। সবচেয়ে অব্যর্থ যে ফন্দির আশ্রয় নেয়া হয়, তা এই যে, অভিভাবকরা যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, সে অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে তার জ্যেষ্ঠা বোন, বা চাচাতো বোন বা অন্য কোন বয়স্কা প্রতিবেশীনীকে আদালতে এনে দেখিয়ে দেয় যে, একে বিয়ে দিতে চাওয়া হচ্ছে। ফলে আদালত নির্দ্বিধায় সম্মতি দিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এই হস্তক্ষেপের কী স্বার্থকতা থাকে?

www.amarboi.org

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এ যুগ—মানুষের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগামিতার যুগ। মানুষ মাত্রেই নিজের সমস্যাবলী অনুধাবন করে। যুবক-যুবতীরা বিয়ের সমস্যা ও ঝক্কিঝামেলা কেমন, তা ভালো করেই জানে। যুবক-যুবতী স্বয়ং বিয়েকে কল্যাণকর মনে করে সম্মতি না দেয়া পর্যন্ত সাধারণত অভিভাবকরাও তাতে সম্মতি দেয় না। অনুরূপভাবে অল্পবয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়ার ফলাফল কী হয়ে থাকে, তাও অভিভাবকদের অজানা থাকেনা। কাজেই তারা যখন তাদের কন্যাদেরকে বয়োপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এটাকে তারা কল্যাণকরই মনে করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন পিতামাতা তো স্বার্থের লোভে তাদের মেয়েকে জোরপূর্বক বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথেই বিয়ে দিয়ে থাকে। এর জবাব এই যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাবে কোন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়েতে রাজী করার অধিকার পিতামাতা বা অভিভাবকের নেই। মেয়ের স্বতস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেয়ার কোনই অবকাশ নেই। সুতরাং মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে আর্থিক সুবিধা লাভ করা থেকে পিতামাতা বা অভিভাবককে বিরত রাখার ব্যবস্থা ইসলামী আইনের রয়েছে। আর ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুসারেই যখন অধিকাংশ মুসলিম দেশের পারিবারিক আইন রচিত, তখন এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

২. বয়োপ্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা

আমি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তরুণ-তরুণীদের বিয়ের পক্ষপাতী। কেননা এতে তাদের চরিত্রের নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হয়, তাদের দায়িত্ব জ্ঞান শাণিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর, বিশেষত স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যও তা উপকারী।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, নারীর জীবনে সন্তান জন্ম দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে দৈহিক কষ্ট হয়, তা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে এমন কথা কেউ বলেনি। শরীর ও মন, নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় ডক্টর ভিক্টর বোজো মল্টস এই মতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন ঃ

"এ কথা অকাট্য সত্য যে, নারীর স্বাস্থ্যের গঠনে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উকরণ। আমি এ কথা সমর্থন করি না যে, বেশী সন্তান প্রসব করলে মেয়েদের আয়ু কমে যায়। কেননা আমরা সবাই জানি, এমন বহু মহিলা রয়েছে, যারা প্রচুর সংখ্যক সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং দীর্ঘজীবী হয়েছেন।"

এই প্রসংগে যুবক-যুবতীদের বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মসংস্থান পর্যন্ত বিয়েকে বিলম্বিত করা আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর কাজ বলে মনে করি। এর ফলে নানা রকমের সামাজিক অপরাধ জন্ম নেয়ার আশংকা রয়েছে। তবে কর্মসংস্থানের পূর্ব পর্যন্ত বৈবাহিক জীবনকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ী ও ঝামেলামুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যুবক-যুবতীদের

www.amarboi.org

চরিত্র সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখার বৃহত্তর স্বার্থে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জানা গেছে যে, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৪০ শতাংশ লেখাপড়ার পাশাপাশি বিবাহিত জীবন যাপন করছে। সেখানকার অধ্যাপকগণও একে উৎসাহিত করে থাকেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হার্ডন বলেছেন যে, ছাত্রজীবনে বিয়ে ক্ষতিকর তো নয়ই, উপরন্তু তা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ও অধিকতর সময়ানুবর্তী হতে সাহায্য করে। (আল-ওয়াহদাতুদ্ দামাশকিয়া পত্রিকা, ৫/১১/১৯৬১)

তবে এ জন্য বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক রীতিপ্রথা ও দৃষ্টিভংগীতে ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন আনা অপরিহার্য, যাতে বিয়ের আর্থিক ব্যয়ভার বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। আমি মনে করি, এ ব্যাপারে তরুণ সমাজের এবং বিশেষভাবে নারী সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে। সামাজিকভাবে বিয়েকে সহজলভ্য ও ব্যভিচারকে কঠিন করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংস্কারমুখী কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে তা ইসলামী শরিয়তের দাবী যেমন পূরণ করবে, তেমনি সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বড় রকমের বয়সের ব্যবধান থাকা উচিত নয়

যে সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও উচ্চতর সামাজিক লক্ষ্যসমূহের মর্যাদা দেয়, সে সমাজে আইন রচনার কাজ সমাজের প্রাজ্ঞ সদস্যদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। তারা বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে কোন জিনিসকে সুনির্দিষ্ট করা, প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বা বৈধ করতে পারেন।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য এবং তার সুমহান সামাজিক লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থেকেছে। আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মানসিক শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা নিশ্চিত করা। তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা এবং এমন একটি সৎ সামষ্টিক অবকাঠামো বিনির্মাণে সহযোগিতা করা, যা মানব সমাজকে একটি শক্তিশালী কর্মক্ষম ও সৎ প্রজন্ম উপহার দিতে পারবে।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা হয়নি। কেননা এ জিনিসটা সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাজ্ঞবান লোকেরা আপনা থেকেই বুঝে নিতে পারে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে মানুষের ভেতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা অধিক বয়স্কদের মধ্যে এমন লোক প্রচুর রয়েছে, যারা দাম্পত্য দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষমতায়, স্ত্রীকে সুখী করার যোগ্যতায় এবং গৃহকে আনন্দ ও উল্লাসে মাতিয়ে রাখার ব্যাপারে বহু অল্পবয়সী তরুণের চেয়ে অধিক দক্ষ, সফল ও কুশলী।

তবে কিছু কিছু অভিভাবক এমন স্বার্থান্ধ হয়ে থাকেন, যারা স্থায়ী ক্ষতির কথা বিবেচনায় না এনে উপস্থিত লাভকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। আর এই স্বার্থান্ধ চিন্তার ভিত্তিতেই তারা

www.amarboi.org

আপন কন্যাদেরকে দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম অথচ বিত্তশালী বৃদ্ধ লোকদের সাথে বিয়ে দেন। একটি যুবতী মেয়েকে এ ধরনের বিয়ে দেয়া প্রকৃত পক্ষে তাকে কবরে পাঠানোর শামিল।

এ ধরনের লোকেরা তাদের কন্যাদের প্রতি যারপরনাই অবিচার করে থাকে। শরীয়ত স্পষ্ট ভাষায় তাদের এ কাজ নিষিদ্ধ না করলেও যে মহৎ উদ্দেশ্যে সে বিয়ের বিধান প্রবর্তিত করেছে, তা এ কাজ নিষিদ্ধ করে এবং এইসব অভিভাবককে তিরস্কৃত করে।

কোন কোন ফকীহ এ ধরনের বিয়েকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। দুঃখের বিষয় যে, সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মতিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত না হওয়ায় অনেক অভিভাবক নিজেদের যুবতী কন্যাকে নিছক সম্পত্তির লোভে মরণোন্মুখ বৃদ্ধদের সাথে বিয়ে দিয়ে থাকে। এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে যুবতী মেয়েরাও এ ধরনের স্বামী বেছে নেয়। অথচ এ ধরনের বিয়ে কোন যুবতী নারীর সতীত্ব রক্ষায় সাহায্য করে না এবং তার দাম্পত্য সুখও নিশ্চিত করে না। সুতরাং ইসলামী আইনে এ বিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ও কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা না হলেও ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে ইসলামী আইন প্রণেতাগণের তাতে হস্তক্ষেপ ও বাধা দান করা কর্তব্য। কেননা এ ধরনের বিয়ে সমাজে ব্যাপক বিকৃতি ও অপরাধের জন্ম দিতে পারে, এ আশংকা প্রবল। তাই স্বামী-স্ত্রীর বয়সে বড় রকমের ব্যবধান থাকলে এবং এ দ্বারা কোন বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করা না হলে আদালতকে এ ধরনের বিয়েতে বাধা দেয়ার অধিকার প্রদান করার ব্যবস্থা প্রত্যেক ইসলামী দেশের আইনে থাকা উচিত। সেই সাথে এই ব্যবধানের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় করার ভারও আদালতকে দেয়া উচিত। আমার মতে, সর্বোপরি ২০ বছরের বেশী ব্যবধান অনুমোদনযোগ্য নয়।

৪. বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের একনায়কত্ব অবাঞ্ছিত

আমাদের মুসলিম সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যে ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, তাতে যুবতী কন্যার স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে মা-বাপের পছন্দ অপছন্দ মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। একদিকে কুমারী যুবতী কন্যা যেমন নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লজ্জা পায়, অপর দিকে তেমনি বিরাজমান সামাজিক পরিবেশও তাকে পিতামাতা ও অভিভাবকদের ইচ্ছায় আপত্তি জানানোর অধিকার দেয় না। অথচ বহু ক্ষেত্রে এই কারণেই বিয়ে ব্যর্থ হয়ে থাকে এবং এর সাথে অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনাও সংযুক্ত হয়।

ইসলামী আইনের কোথাও সুস্পষ্টভাবে এরূপ একনায়কসুলভ ক্ষমতা অভিভাবককে দেয়া হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে কোন কোন মাযহাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, পিতা তার কুমারী যুবতী কন্যাকে নিজের ইচ্ছামত জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে, তবে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই কুমারী কন্যার মতামত নেয়া মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয়।

www.amarboi.org

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সম-মতাবলম্বীগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে জোর করে বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার পিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের নেই। বিয়ে দেয়ার সময় কন্যার মতামত নেয়া অপরিহার্য। সে মত দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে, নচেৎ শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবু হানিফার এই রায় অনুসারেই মুসলিম আদালতগুলো কাজ চালিয়ে আসছে। ফলে যুবতী কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার কোন অনুমতি ছিলনা। তবে এই সাথে ইমাম আবু হানিফা অভিভাবকদেরকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, তারা দুইটি ক্ষেত্রে যুবতী কন্যার নিজ পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করার আপত্তি তুলতে পারেন ঃ

প্রথমতঃ যখন স্বামী ও স্ত্রী সমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার অধিকারী (কুফু) হয় না। তবে এই ক্ষমতার মাপকাঠি নিরূপণে ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য ইমামদের মতভেদ রয়েছে। এই মাপকাঠি বংশীয় মর্যাদা, পেশা, পিতা ও দাদাদের মর্যাদা ও বিত্ত-বৈভব ইত্যাদির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ অভিভাবকদের হস্তক্ষেপের জন্য খুবই প্রশস্ত সুযোগ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মোহরের পরিমাণ যদি এরূপ ধার্য করা হয়, যা তার রক্ত সম্পর্কীয় অন্যান্য বিবাহিতা নারীর কারো মোহরের সমান নয়। (মোহরে মিসিল) এরূপ ক্ষেত্রে পিতা ও অভিভাবকগণের মর্যাদাহানি ঘটে বিধায় তারা এ ধরনের বিয়ে ভেংগে দিতে পারেন। (অর্থাৎ কিনা ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে কন্যা ও অভিভাবক উভয়ে সীমিত "ভেটো ক্ষমতার" অধিকারী)।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সামাজিক জীবনে ব্যাপক বিবর্তন ঘটার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভংগীতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সিরীয় পারিবারিক আইনে এ সমস্যাটার যে সমাধান দেয়া হয়েছে, তা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এ আইনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমতার আবশ্যকতাকে বহাল রাখা হয়েছে এবং নীতিগতভাবে এটা দাম্পত্য সুখ ও সমঝোতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সমতা কিসে কিসে ও কীভাবে নির্ণিত হবে, সেটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থান, কাল ও সমাজের প্রচলিত স্বীকৃত রীতি প্রথার ওপর। এটা একটা বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা, যা প্রত্যেক যুগে পারিবারিক সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম।

এ আইনে পিতাকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তিনি তার যে যুবতী কন্যা তার অমতে বিয়ে করেছে, তার বিরুদ্ধে আদালতে অসম বিয়ে করার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আদালত তদন্ত করে যদি নিশ্চিত হয় যে, পিতার অভিযোগ সত্য, তাহলে বিয়ে ভেংগে দেবে, নচেত তা বহাল রাখবে।

এভাবে এ আইনটি পিতামাতার মাত্রাতিরিক্ত একনায়কসুলভ হস্তক্ষেপ এবং কন্যার লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা-দুটোকেই রোধ করেছে।

www.amarboi.org

৫. বিয়ের শর্তাবলী

বিয়ের চুক্তিতে কোন বিশেষ জিনিসের শর্ত আরোপ করা অনেক সময় স্ত্রীর স্বার্থের অনুকূল হয়ে থাকে। ইসলামী আইনে এ ধরনের শর্ত আরোপের বিরোধী নয় - যদি তা সাধারণ জনস্বার্থ, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য— লক্ষ্য ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী না হয়।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সকল মাযহাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তা এই যে, বিয়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, এমন যে কোন শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমন এরূপ শর্ত আরোপ করা যে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবেনা বা স্বামী স্ত্রীর খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকবেনা ইত্যাদি। এ ধরনের শর্ত দ্বারা বিয়েই বৈধ হবেনা।

আর যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয় যা দাম্পত্য সম্পর্কের সাথে সংগতিশীল নয়, কুরআন হাদীস দ্বারাও তা সমর্থিত নয় এবং দেশের প্রচলিত রীতির খেলাপ, তবে সে ক্ষেত্রে বিয়ে বৈধ ও শর্ত বাতিল হবে, এমনকি যদি দুই পক্ষ তাতে সম্মত হয় তবুও। যেমন স্ত্রীকে নিয়ে তার পৈতৃক শহর বা গ্রামের বাইরে যাওয়া যাবেনা, আর কোন বিয়ে করা যাবেনা, দেনমোহর দেয়া হবেনা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী খোরপোশ বহন করতে হবে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবেনা, স্ত্রীকে একাকিনী সফর করতে বা অনুরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজের সুযোগ দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক রকমের শর্ত রয়েছে, যা বৈধ, তবে তা কার্যকরী করতে স্বামীকে আইনত বাধ্য করা যায় না, কিন্তু সম্মতি দিয়ে কার্যকরী না করলে স্ত্রী বিয়ে বাতিল করার অধিকারী হবে। যেমন, স্বামী বিদেশে যেতে পারবেনা, চাকুরী করতে পারবেনা, রাজনীতি করতে পারবেনা, নতুন বিয়ে করতে পারবেনা বা পূর্বতন স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে- ইত্যাদি।

এ থেকে বুঝা গেল যে, বিয়ের মূল উদ্দেশ্য নস্যাত না হয় এমন যে কোন শর্ত আরোপ করার এবং প্রয়োজনে শর্ত লংঘন করলে বিয়ে বাতিল করারও স্বাধীনতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বিয়ের কাবিনে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয়া এবং তার অনুমতি ছাড়া নতুন বিয়ে করলে দুই স্ত্রীর একজন তালাক হয়ে যাবে - এই মর্মে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শর্ত আরোপ করা হলে এই শর্ত মেনে চলতে স্বামী বাধ্য থাকবে। এ শর্ত কোন অবস্থাতেই বাতিল হবেনা।

www.amarboi.org

বহুবিবাহ ও ইসলাম

পাশ্চাত্যের ঘোরতর ইসলাম বিদ্বেষী, ধর্মবেত্তা, প্রাচ্যবিদ ও সাম্রাজ্যবাদী মহল বহুবিবাহের ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়ে আসছে। এটাকে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে নারীর ওপর নির্যাতন, শোষণ ও যৌন নিপীড়ন চালানোর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। এই অপপ্রচারে পাশ্চাত্যবাদী যে চরম অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সম্পূর্ণ অসাড় যুক্তির অনুসারী, তা বেশী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।

নিম্নের কয়েকটি তথ্য এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখেঃ

১. ইসলাম বহুবিবাহ প্রথার প্রথম প্রবর্তক নয়। অতীতের প্রায় সকল জাতিতেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক, চৈনিক, ভারতীয়, ককেশীয়, আশেরীয়, মিশরীয় প্রভৃতি সব জাতিতেই বহুবিবাহ চালু ছিল। এই জাতিগুলোর অধিকাংশেই শুধু বহু বিবাহ চালু ছিল তা নয়, বরং তারা এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলতোনা। চীনের 'লেসকী' আইনে তো 'একশো ত্রিশজন' পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। চীনের জনৈক শাসকের স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার ছিল বলে শোনা যায়!

২. ইহুদী ধর্মেও অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। তাওরাতের অনুসারী নবীগণের প্রত্যেকেরই ছিল বহু সংখ্যক স্ত্রী। তাওরাতে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মানের সাত শো স্ত্রী এবং তিনশো দাসী ছিল।

৩. খৃস্টধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকারী কোন সুস্পষ্ট আইন নেই। কেবল উপদেশ ছলে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। এ কথার দ্বারা বড়জোর সাধারণ অবস্থায় এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বুঝা যায়। এ ধরনের কথা ইসলামেও বলা হয়েছে। আমরাও তা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কোথায় আছে যে, কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ে করাই অবৈধ হবে এবং ব্যভিচারে গণ্য হবে? বাইবেলের কোন পুস্তকেই এমন কথা লেখা নেই, বরঞ্চ সেন্টপলের পুস্তকের কোথাও কোথাও এমন উক্তি পাওয়া যায়, যা দ্বারা একাধিক বিবাহের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এক জায়গায় তিনি বলেন, "পাদ্রীর জন্য এক স্ত্রীর স্বামী হওয়া বাধ্যতামূলক।" এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, পাদ্রী ছাড়া অন্যদের জন্য একাধিক স্ত্রী বৈধ।

ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, প্রাচীন খৃস্টানরা একাধিক বিয়ে করতো। এমনকি প্রাচীনকালের ধর্মযাজকদেরও কারো কারো একাধিক স্ত্রী থাকতো। বিশেষ বিশেষ স্থানে ও জরুরী অবস্থায় একাধিক স্ত্রী বিয়ে করা প্রাচীন খৃষ্টীয় আমলে বৈধ মনে করা হতো।

www.amarboi.org

বিয়ের ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ওয়েষ্টার মার্ক (Wester Mark) বলেনঃ গীর্জার স্বীকৃত প্রথা হিসাবে বহু বিবাহ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। ওয়েষ্টার মার্ক আরো বলেনঃ আয়ারল্যান্ডের রাজা ডিয়ার মাষ্টাটের দু'জন স্ত্রী ও দু'জন রক্ষিতা ছিল। শার্লম্যানেরও দুই স্ত্রী ও বহু রক্ষিতা ছিল। তার কোন কোন আইন থেকেও বুঝা যায় যে, ধর্মযাজকদের কাছেও বহুবিবাহ কোন অজানা বিষয় ছিলনা।

মার্টিন লুথার অকুণ্ঠ চিত্তে একাধিক বিয়ের বৈধতা স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন যে, আল্লাহর আদেশে কখনো বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হয়নি। আল্লাহ অনেককে বিশেষ অবস্থায় বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। কোন খৃষ্টান তাদের অনুসরণ করতে চাইলে করতে পারে যদি সে মনে করে, সে একই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন। কেননা সর্বাবস্থায় তালাকের চেয়ে বহু বিবাহ ভালো।

১৬৫০ সালে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপক লোক ক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে নুরেমবার্গে ঘোষণা করা হয় যে, এক সাথে দুই স্ত্রী রাখা বৈধ। এমনকি কোন কোন খৃষ্টান উপদল বহু বিবাহকে বাধ্যতামূলক বলেও ঘোষণা করে।

অধ্যাপক আক্কাদ বলেনঃ খৃস্টধর্মে একাধিক বিয়ের মত একাধিক রক্ষিতা রাখাও বৈধ ছিল। এমনকি পাশ্চাত্যে দাসী রাখারও অনুমতি ছিল এবং অর্থনৈতিক সামর্থ এবং বিদেশ থেকে দাসী আমদানীর জটিলতা ছাড়া একে সীমিত করার মত কোন শর্তও আরোপ করা হতোনা। কোন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তাকে তালাক দেয়ার পরিবর্তে রক্ষিতা গ্রহণের উপদেশ দিতেন। আদর্শ বিবাহ নামক পুস্তকের ১৫শ অধ্যায়ে পাদ্রী অগাষ্টাইন স্পষ্ট ভাষায় বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে রক্ষিতা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

জুর্জী যায়দান বলেনঃ খৃষ্টধর্মে এই মর্মে কোন অকাট্য ধর্মীয় বিধান নেই যে, এক সাথে একাধিক বিয়ে করা যাবেনা। ইচ্ছে করলে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া যেত। কিন্তু খৃষ্টধর্মের প্রাচীন নেতৃবৃন্দ পারিবারিক ঐক্য ও শৃংখলা রক্ষার জন্য এক বিয়েকে অধিকতর সহায়ক মনে করেন। তাছাড়া রোমক রাষ্ট্রে এটাই প্রচলিত ছিল। তাই বাইবেলের বিয়ে সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে তাদের অসুবিধা হয়নি। এভাবেই একাধিক বিয়ে অবৈধ হওয়া সংক্রান্ত বিধিটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

৪. সমকালীন খৃষ্টধর্ম যে কৃষ্ণ আফ্রিকায় একাধিক বিয়ের প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেটা আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি। আফ্রিকার পৌত্তলিকদের মধ্যে এই প্রথাটি যে একটি সর্বব্যাপী সামাজিক বাস্তবতা, তা দেখতে পেয়ে সেখানে প্রেরিত খৃষ্টান মিশনারীরা বুঝতে পারে যে, একাধিক বিয়ের বিরোধিতা করলে পৌত্তলিকদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা আফ্রিকী খৃষ্টানদের জন্য বহুবিবাহ সীমাহীনভাবে বৈধ করা অপরিহার্য বলে মত ব্যক্ত করে। "মধ্য আফ্রিকান অঞ্চলে ইসলাম ও খৃষ্টবাদ" নামক পুস্তকে জনাব নোরজেহ বলেনঃ (পৃঃ ৯২-৯৮)

www.amarboi.org

"মিশনারীগণ বলতেন যে, পৌত্তলিকদেকে আমরা যেসব সামাজিক রীতি প্রথার অনুসারী পেয়েছি, তাতে হস্তক্ষেপ করা আমাদের নীতি নয়। আর যতক্ষণ এই কালো খৃষ্টানরা যিশুখৃষ্টের ধর্মের প্রতি অনুগত থাকবে, ততক্ষণ তাদেরকে তাদের স্ত্রীদেরকে উপভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা আমাদের পক্ষে আদৌ দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবেনা। বরঞ্চ তাওরাত যতক্ষণ এই বহুবিবাহের অনুমতি দিচ্ছে-এবং তাওরাতকে খৃস্টানদের ধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা কর্তব্যও বটে-ততক্ষণ বহুবিবাহকে কোন ক্ষতি নেই। এমন কি খোদ যিশুও এই বলে বহু বিবাহকে বৈধ করে দিয়েছেন যে, "মনে করোনা যে, আমি ধ্বংস করতে এসেছি, আমি বরং পূর্ণতা দান করতে এসেছি।"

অবশেষে একদিন গীর্জা সরকারীভাবে আফ্রিকী খৃষ্টানদের জন্য অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেয়।

৫. পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোও দু দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পরে সৃষ্ট বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষে চলে গেছে। কারণ বহুবিবাহ তাদের সমস্যাবলীর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

জার্মানীর মিউনিখে ১৯৪৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরব দেশসমূহ থেকে জনকয়েক শিক্ষক অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি এই সমস্যার সমাধান কল্পে কয়েকটি প্রস্তাবিত সমাধান পর্যালোচনা করে। কমিটির মুসলিম সদস্যবৃন্দ এ সমস্যার সমাধান কল্পে এক পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রথমে প্রস্তাবটি শুনে অনেকে নাক সিটকায় ও বিস্ময় প্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘ বিতর্ক ও আলাপ আলোচনার পর কমিটি শেষ পর্যন্ত দেখতে পায় যে, এ ছাড়া আর কোন বিকল্প সমাধান নেই। তাই কমিটি সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করে।

১৯৪৯ সালে বনের অধিবাসীরা একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজনের দাবী জানায়। এ ছাড়া জার্মান সরকার সম্প্রতি আল-আজহারের মুসলিম ফিকাহবিদগণের নিকট ইসলামের বহুবিবাহ ব্যবস্থার বিবরণ জানতে চায়। কেননা তারা সেখানকার স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যার সমাধানে ঐ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে উপকৃত হতে আগ্রহী। এ সব চেষ্টার পূর্বে নাৎসি আমলেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা চলে। হিটলার স্বয়ং এই ব্যবস্থা প্রচলনে আগ্রহী ছিলেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় হিটলারের সে ইচ্ছা বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি।

বৃটেনের সপ্তম এড্ওয়ার্ডও একাধিক বিবাহ চালু করতে চেয়েছিলেন এবং এই মর্মে

www.amarboi.org

একটি রাজকীয় ফরমান প্রস্তুতও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সে চেষ্টা বানচাল করে দেয়।

বেশ কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ বহুবিবাহ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। তাদের মধ্যে গ্রেটিয়াস Grotius অন্যতম।

বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক শোবিনহোর বলেনঃ "ইউরোপে প্রচলিত বিয়ে সংক্রান্ত আইন পুরুষকে নারীর সমান গণ্য করে। এ আইনের ভিত্তিই ভ্রান্ত। এ আইন আমাদেরকে এক স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে। এভাবে আমাদেরকে অর্ধেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। অথচ আমাদের ওপর দায় দায়িত্ব স্ত্রীর চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ আইন স্ত্রীকে যখন পুরুষের সমান অধিকার দেয়, তখন তাকে পুরুষের সমান বুদ্ধিও দেয়া উচিত ছিল।" শোবিনহোর আরো বলেনঃ "যে জাতিগুলো বহুবিবাহ অনুমোদন করে, তাদের কোন নারী তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত এমন পুরুষকে স্বামী হিসাবে বরণ করতে অসম্মত হয়না। আমাদের সমাজে তো বিবাহিতা নারীর সংখ্যা খুবই কম। অবিবাহিতাদের সংখ্যা অগণিত। তাদের কোন অভিভাবক নেই। বিত্তশালী শ্রেণীতে এ ধরনের কুমারীদের অনেককেই দেখা যায়, বুড়ী হয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় এবং ব্যর্থ জীবনের জন্য হাহুতাশ করে। আর যারা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, তারা যারপর নাই কষ্টকর জীবন যাপন করে। কেউ কেউ আপন মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং চরম অবমাননাকর বেশভূষায় সজ্জিত হয়। একমাত্র লণ্ডনেই এমন প্রায় আশি হাজার গণিকা নারী বিদ্যমান (এটা শোবিনহোরের সময়কার কথা!) যারা শুধুমাত্র এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারবেনা এই মতবাদের শিকার হয়ে বিয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এহেন মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। সতীনের ঘর না করার একগুয়েমিই ইউরোপীয় নারী এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। এরপরও কি একাধিক বিয়ের ব্যাপারটিকে নারীজাতির জন্য একটা অনিবার্য বাস্তবতা হিসাবে মেনে নেয়ার উপযুক্ত সময় আমাদের হয়নি? নীতিগতভাবে যখন ভেবে দেখি, তখনও পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের পথে বাধা থাকার কোন কারণ দেখতে পাইনা, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে স্ত্রী মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয়, বন্ধ্যা থাকে অথবা পংগু হয়ে যায়। মরমী গোষ্ঠী তো (প্রোটেষ্ট্যান্টদের একটি উপদল, যারা একাধিক বিয়েকে অনুমোদন করে এবং কার্যকরও করে। তাদের বহু গীর্জা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।) এই একক বিয়ের বাধ্যতাবাধকতাকে বাতিল না করে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফলই হয়নি।" ("ইসলাম সভ্যতার প্রাণ" গেলাইনী, পৃঃ ২২৪)

"আরব সভ্যতা" নামক পুস্তকে গোস্তাভ লুবান মুসলমানদের বহুবিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "বহু বিবাহ প্রথার মত এমন আর কোন সামাজিক প্রথা আমরা দেখতে পাইনে, যার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা এমন কঠোর সমালোচনায় মুখর। আবার একথাও সত্য যে, বহু বিবাহ প্রথাকে উপলব্ধি করতে

www.amarboi.org

ইউরোপীয়রা যেরূপ ভুল করেছে, আর কোন জিনিষের ক্ষেত্রে অত বড় ভুল করেনি। অধিকাংশ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মনে করেছেন যে, বহু বিবাহই ইসলামের মূল ভিত্তি, এটাই কুরআনের প্রসারের পথ উন্মুক্ত করেছে এবং এটাই প্রাচ্যবাসীর অবনতির প্রধান কারণ। পাশ্চাত্যবাসী এসব ধারণার বশবর্তী হয়েই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোরতম নিন্দায় সোচ্চার থেকেছে এবং ভেবেছে যে, এ দ্বারা তারা মুসলমানদের হেরেমে অবরুদ্ধ সেইসব অসহায়া নারীদের প্রতি বিরাট করুণা প্রদর্শন করেছে, যাদেরকে খাসীকৃত দুর্ধর্ষ জোয়ানরা সর্বক্ষণ পাহারা দেয়, আর যখনই তাদের মনিবরা তাদেরকে অপছন্দ করে তখনই তাদেরকে হত্যা করা হয়!

অথচ এই বিবরণ সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব। আমি আশা করি, পাঠক যখন ইউরোপীয়দের এইসব কল্পিত ধারণাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন বুঝতে পারবে যে, প্রাচ্যের বহু বিবাহ প্রথা একটা উত্তম ও পবিত্র ব্যবস্থা, যা এই ব্যবস্থার অনুসারী জাতিগুলোর নৈতিকতার মান উন্নত করে, পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করে এবং নারীকে সেই সুখ ও সম্মান দান করে, যা থেকে ইউরোপের নারী সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

মনে রাখতে হবে যে, বহুবিবাহ শুধু ইসলামেরই প্রবর্তিত প্রথা নয়। ইতিপূর্বে ইহুদী, পারসিক, আরব ও অন্যান্য প্রাচ্য জাতি মুহাম্মাদ (সা) এর আবির্ভাবের আগেও এই প্রথার সাথে পরিচিত ছিল । সেইসব জাতির মধ্যে যখন ইসলাম প্রবেশ করেছে, তখন তারা এটাকে কোন অভিনব জিনিস মনে করেনি। তথাপি এমন কোন শক্তিশালী ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনা, যা মানুষের স্বভাবকে এতদূর পাল্টে দিতে পারে, যাতে সে প্রাচ্যের পরিবেশ, জীবন যাপন পদ্ধতি ও প্রজাতিগত রীতিপ্রথা থেকে উদ্ভূত বহু বিবাহ প্রথাকে গ্রহণ বা বর্জনে বাধ্য হয়।

প্রজাতিক ও প্রাকৃতিক প্রভাবের তীব্রতা এত স্পষ্ট যে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। যেহেতু নারীর দৈহিক গঠন, মাতৃত্ব ও রোগব্যাধি ইত্যাদি তাকে বেশীর ভাগ সময় স্বামী থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে এবং যেহেতু প্রাচ্যের সামাজিক পরিবেশ ও প্রাচ্যবাসীর স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজের দিক দিয়ে নারীর সাময়িকভাবে স্বামীহীন থাকা সম্ভব নয়, তাই বহু বিবাহের মতবাদ একটা অনিবার্য ব্যাপার।

আর যেহেতু পাশ্চাত্য পরিবেশ ও মেযাজ অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাই আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়া এক বিবাহের কড়াকড়ি অচল। স্বভাবগতভাবে তথা স্বতস্ফূর্তভাবে এই কড়াকড়ি মেনে চলার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রাচ্যবাসীর অনুসৃত আইনগত বহুবিবাহ প্রথাকে পাশ্চাত্যের গোপন বহুবিবাহ (উপপত্নি গ্রহণ) প্রথার চেয়ে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন মনে করার পক্ষে আমি কোন কারণ দেখিনা। বরঞ্চ আমি তার বিপরীত মনোভাবই পোষণ করি। আমার দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাসীর অনুসৃত রীতি অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক।"

www.amarboi.org

এরপর গোস্তাভ লুবান তাঁর পুস্তকে বিশিষ্ট ধর্ম বিশেষজ্ঞ "লোবেলেহ" এর পুস্তক "প্রাচ্যের শ্রমিকগণ" থেকে তার মতামত উদ্ধৃত করেন। লোবেলেহ লিখেছেন যে, প্রাচ্যের কৃষিনির্ভর পরিবারে স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো একটা বাস্তব ও অনিবার্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলে অনুভূত হয়ে থাকে। এমন কি স্বয়ং স্ত্রীরাই নিজ নিজ স্বামীকে আরো স্ত্রী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে এবং তাতে তারা মোটেই কোন মনোকষ্ট অনুভব করেনা। অবশেষে গোস্তাভ লুবান নিজের এই মন্তব্য দিয়ে তার আলোচনার সমাপ্তি টেনেছেন "(বহু বিবাহ সম্পর্কে) ইউরোপীয়দের এই মতামতের কারণ এই যে, তারা বিষয়টাকে তাদের নিজস্ব ও ভাবাবেগের আলোকে বিবেচনা করে থাকে এবং অন্যদের ভাবাবেগকে তার বিবেচনায় আনেনা।" তিনি বলেছেনঃ "বিভিন্ন ধ্যানধারণার অবসান বা নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভবের জন্য মাত্র কয়েকটি প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়াই যথেষ্ট।" (আরব সভ্যতা, পৃঃ ৪৮২-৪৮৬)

ভেষ্টার মার্ক স্বীয় ইতিহাস পুস্তকে বলেনঃ "পাশ্চাত্য আইনে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যাপারটির চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়নি। এ বিষয়ে দৃষ্টিভংগীর বারবার পরিবর্তন ঘটতে পারে। আধুনিক সমাজে যখনই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে, তখনই পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে মতামতের পরিবর্তন ঘটবে।" অতঃপর ভেষ্টার মার্ক প্রশ্ন তোলেনঃ এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকাটা কি চিরদিনের জন্য সমাজ ব্যবস্থায় স্থায়ী ব্যবস্থার সূচনা করবে? অতঃপর নিজেই জবাব দেনঃ এ প্রশ্নের রকমারি জবাব দেয়া হয়েছে। স্পেনসার মনে করেন যে, এক স্ত্রীর ব্যবস্থাটাই পারিবারিক ব্যবস্থার শেষ কথা। এ ব্যবস্থার যত রকমের পরিবর্তনই ঘটুক, শেষ পর্যন্ত তা এক স্ত্রীর ব্যবস্থাতেই গড়াবে। পক্ষান্তরে ডক্টর লেপন (Lepon) মনে করেন যে, ইউরোপীয় আইন একদিন বহুবিবাহ অনুমোদন করবে।

অধ্যাপক এহরেনবেল (Ehrenbel) তো এতদূর বলে ফেলেছেন যে, "আর্য প্রজাতি"কে রক্ষা করতে হলে বহুবিবাহ চালু করতেই হবে।

উপসংহারে ভেষ্টর মার্ক সামাজিক অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এক স্ত্রী ব্যবস্থাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

বহুবিবাহের প্রয়োজনীয়তা

অবশ্য ভাবাবেগ বর্জিত হয়ে বিচার বিবেচনা করলে বহুবিবাহের উপকারিতা এবং অপকারিতা উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। তবে উপকারিতাগুলো মৌলিক নয়— আপেক্ষিক। আসলে এক স্ত্রীর ব্যবস্থাই যে,উত্তম, অধিকতর স্বভাবসুলভ, পরিবারকে অধিকতর টেকসই করতে সক্ষম এবং পরিবারে একাত্মতা ও পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা রক্ষায় অধিকতর সহায়ক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ জন্য বুদ্ধিমান বিবাহিত লোকেরা অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া একাধিক বিয়ের কথা চিন্তাই করেনা। এই প্রয়োজন দু'রকমেরঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক।

www.amarboi.org

বহুবিবাহের সামাজিক প্রয়োজন

যে সামাজিক প্রয়োজনগুলো মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে, তার সংখ্যা অনেক। আমরা এখানে শুধু দু'টো অবস্থার উল্লেখ করতে চাই, যার সংঘঠিত হওয়ার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনাঃ

১. স্বাভাবিক অবস্থায় কোথাও পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে—

উত্তর ইউরোপের দেশগুলোতে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেও এবং শান্তির সময়েও পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফিনল্যাণ্ডের প্রতি চারটি বা তিনটি শিশুর একটি পুরুষ এবং অবশিষ্টগুলো স্ত্রী হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বহুবিবাহ সামজিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। পুরুষের অনুপাতে যারা অতিরিক্ত, সেই নারীদের নিজেদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে এবং অভিভাবকহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বহু বিবাহ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে স্বামীর সংসারে ঠাঁই নেয়া বহুগুণে উত্তম। মানুষের সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে শ্রদ্ধা করে এমন কোন ব্যক্তি বহুবিবাহ ব্যবস্থার চেয়ে সমাজে বেশ্যাবৃত্তির বিস্তৃতিকে অগ্রগণ্য মনে করতে পারেনা। এরূপ মানসিকতা কেবল সেই ব্যক্তিই পোষণ করতে পারে যে নিজের প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনার কাছে পরাজিত এবং সে কারণে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহন না করেই তাদের দ্বারা শুধু কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। এ ধরনের লোকেরা সমাজের আবর্জনা স্বরূপ এবং স্বয়ং নারীজাতির শত্রু। এক স্ত্রী প্রথার সমর্থক হওয়া তাদের জন্য সম্মানসূচক তো নয়ই, বরং তাদের এ ধরনের নোংরা জীবন তাদের নারী অধিকার রক্ষার গালভরা বুলিকে বিদ্রুপ করে মাত্র।

বর্তমান শতাব্দির শুরু থেকেই পাশ্চাত্যের প্রতি লোকেরা এই মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আসছে যে, বহুবিবাহ রোধের পরিণামে নারীদের ভবঘুরে ও বখাটে হয়ে যাওয়া, ব্যভিচারের ব্যাপক প্রসার এবং যারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে। আর এসব আপদ সমাজ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় হলো বহুবিবাহের অনুমোদন।

"লীগোস উইকলী রেকর্ড" নামক পত্রিকার ২০ শে এপ্রিল ১৯০১ সংখ্যায় "লন্ডন ট্রুস" পত্রিকা থেকে জনৈকা ইংরেজ মহিলার লেখা নিম্নোক্ত পত্র উদ্ধৃতি করেঃ

"আমাদের সমাজে ভবঘুরে মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এ আপদ আজ এক সর্বব্যাপী বিভীষিকার রূপ ধারণ করেছে। অথচ এর কারণ নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ নেই। আমি যেহেতু একজন মহিলা, তাই এই মেয়েদের নিয়ে না ভেবে পারিনা। তাদের ভাবনায় আমার কলিজা ফেটে যেতে চায়। কিন্তু আমার এ ভাবনায় আর আহাজারীতে কী লাভ হবে? সারা দুনিয়ার মানুষ আমার আহাজারীতে শরীক হলেওবা কী উপকার হবে? এই ন্যাক্কারজনক অবস্থার প্রতিকারে কার্যকর কিছু করতে না পারলে শুধু বিলাপ করে কিছু হবেনা। বিশিষ্ট পণ্ডিত টমাসকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই রোগের চিকিৎসার পথ

www.amarboi.org

দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ রোগের পূর্ণাংগ প্রতিকারের উপায় হলো পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দান। একমাত্র এভাবেই এই আপদ দূর হবে এবং আমাদের মেয়েরা গৃহিনী হতে পারবে। ইউরোপের পুরুষদেরকে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করাই আমাদের সমস্যার মূল কারণ। এক স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এই ব্যবস্থা আমাদের মেয়েদেরকে ভবঘুরে বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে পুরুষসুলভ চাকুরীর সন্ধানে ব্যাপৃত করেছে। এ অপরিস্থিতির আরো শোচনীয় অবনতি ঘটবে যদি পুরুষদেরকে একাধিক বিয়ের অনুমতি না দেয়া হয়।... শুধুমাত্র এক বিয়ের বাধ্যবাধকতার কারণে আজ এত জারজ সন্তানের ছড়াছড়ি। তারা সমাজের বোঝা ও কলংক । এইসব শিশু ও তাদের মায়েরা যে অবমাননাকর আযাব ভোগ করছে, তা একাধিক বিয়ে বৈধ হলে ভোগ করতোনা। তাদের ও তাদের সন্তানদের মান-ইজ্জতও রক্ষা পেত, আর প্রত্যেক নারী গৃহিনী এবং বৈধ সন্তানের মাও হতে পারতো যদি একাধিক বিয়ের প্রচলন থাকতো।" (আল মানার, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮০-৪৮৬)

ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে জারজ সন্তানের সংখ্যা যেহারে বেড়ে চলেছে, তা সামাজিক গবেষকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি না থাকলেও পুরুষেরা এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকছেনা এবং বহু সংখ্যক নারী যৌন মিলনের বৈধ পথ খুঁজে পাচ্ছেনা।

২. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগাদিতে নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী মারা গেলে—

ইউরোপ মাত্র সিকি শতাব্দিতে দুটো বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে কোটি কোটি যুবক মারা যায়। ফলে বিপুল সংখ্যক বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারী স্বামী ও অভিভাবকহারা হয়ে পড়ে। তাদের কর্মসংস্থান হলেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা ও ঘনিষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিলনা। এই পুরুষরা যাতে তাদেরকে বিয়ে করতে অথবা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত হয়, সেই চেষ্টা না করে তাদের গত্যন্তর থাকতোনা।

এহেন পরিস্থিতিতে বিবাহিতা স্ত্রীগণ এমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং স্বামী থেকে দূরত্ব ও বিচ্ছেদ সহ্য করতে বাধ্য হতো, যা বৈধ সতীন নেয়ার চেয়েও তিক্ততর ছিল। ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে, বিশেষতঃ জার্মানীতে একাধিক নারী সংগঠন বহুবিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানায়।

বস্তুতঃ যুদ্ধবিগ্রহ ও তার ফলে সংঘটিত ক্ষয়ের দরুন পুরুষের যে ঘাটতি দেখা দেয়, তা পূরণের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা। এমনকি বহুবিবাহের কট্টর বিরোধী স্পেন্সারও পর্যন্ত বলেছেন যে, "যুদ্ধের ফলে বিপুল সংখ্যক পুরুষ মারা গেলে বহুবিবাহ ছাড়া আর কোন উপায়ে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়না। এরূপ অবস্থায় সবদিক দিয়ে সমান শক্তিশালী দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যে যে জাতি তার সকাল প্রজনন

www.amarboi.org

ক্ষমতাসম্পন্ন নারীকে সন্তান প্রজননে নিয়োগ করবে। তার কাছে অপর জাতিটি পরাজিত না হয়ে পারেনা।" (এনসাইক্লোপেডিয়া ফ্রীদোজদী, ৪/৬৯২)

আমি এইসাথে যে কথাটা যোগ করতে চাই তা এই যে, যুদ্ধমান জাতিগুলোর সবকটি যদি এক বিবাহ রীতির অনুসারী হয়, তবু অধিকতর বিলাসী জাতি অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতির সামনে ধ্বংস না হয়ে পারবেনা। কেননা উন্নত ও বিলাসী জাতিটির নারীরা সব সময় কম সন্তান উৎপাদনের পক্ষপাতি হয়ে থাকে, যেমন ফ্রান্স। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতি অধিকতর সন্তান উৎপাদন করে থাকে যেমন রাশিয়া। সুতরাং উন্নত জাতিরও নিজ জনশক্তির ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বহুবিবাহ প্রথা মেনে নেয়া উচিত।

বহু বিবাহের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা

মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে এমন বহু অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তার কয়েকটি উল্লেখ করছিঃ

১. স্ত্রী বন্ধা হলে এবং স্বামী সন্তান চাইলে—

স্বামীর পক্ষে সন্তান কামনা করায় দোষের কিছু নেই। এটা মানব মনের স্বাভাবিক বাসনা। এরূপ অবস্থায় স্বামীকে দুই কাজের একটি না করে উপায় থাকেনাঃ হয় তার বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দেবে, নচেত তার বর্তমানে আরো এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চাইতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ নৈতিকতা ও সৌজন্যবোধের দিক দিয়ে উত্তম ও সম্মানজনক। স্বয়ং বন্ধ্যা স্ত্রীর জন্যও এটা অধিকতর কল্যাণকর। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, স্ত্রী এরূপ অবস্থায় দাম্পত্য আশ্রয় হারানোর চাইতে অন্য একজন সতীনকে মেনে নিয়ে স্ত্রী হিসাবে টিকে থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কেননা বন্ধ্যাত্বের কারণে সে তালাক পেয়েছে- এ কথা জানার পর আর কেউ তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হবে বলে আশা করা যায়না। সাধারণভাবে এরূপই ঘটে থাকে। সতীনকে মেনে না নিতে পারলে তার জন্য দুইটি বিকল্প অবশিষ্ট থাকেঃ অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে নিরাশ্রয় জীবন কাটানো অথবা পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়া। অথচ সতীনসহ স্বামীর গৃহে টিকে থাকলে তার সকল আইনানুগ দাম্পত্য অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা অটুট থাকতো। অধিকার ও খোরপোশের দিক দিয়ে সে দ্বিতীয় স্ত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম থাকতোনা।

আমি নিশ্চিত যে, বুদ্ধিমতী ও সম্ভ্রান্ত নারী এ ক্ষেত্রে স্বামীর একাধিক বিয়েকেই অগ্রগণ্য মনে করবে। আমরা তো দেখেছি যে, বহু বন্ধ্যা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সন্তান প্রজনন সক্ষম নতুন স্ত্রীর খোঁজ স্ব উদ্যোগেই করে থাকে।

২. স্ত্রী যদি এমন কোন দীর্ঘস্থায়ী, সংক্রামক বা স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেককারী রোগে আক্রান্ত হয়, যার দরুন স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম হয়, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামনে দুটো বিকল্প থাকেঃ সে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এতে না থাকে কোন

www.amarboi.org

সৌজন্যবোধ, না থাকে নৈতিক মূল্যবোধ, আর না থাকে এতদিনের প্রেম ভালোবাসার কোন মূল্য। বরঞ্চ একজন রুগ্ন নারীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া হয় এবং চরম উপেক্ষা ও অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো, সে আর একটি বিয়ে করে পূর্বতন স্ত্রীর স্বামী ও অভিভাবক হিসাবে বহাল থাকতে পারে। তাকে সে স্ত্রীর মত অধিকারও দেবে এবং চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভারও বহন করবে। রুগ্না স্ত্রী ও তার স্বামী উভয়ের জন্যই যে এই শেষোক্ত বিকল্পটিই অধিকতর সম্মানজনক, মহানুভবতার পরিচায়ক ও সুখশান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. স্ত্রী যদি এত বেশী বিরাগভাজন হয় যে, তালাকের পূর্বে দুই পক্ষের শালিশদের সমঝোতা প্রচেষ্টা, প্রথম তালাক, দ্বিতীয় তালাক এবং উভয়ের মধ্যবর্তী ইদ্দতের বিরতিও সেই বিরাগ নিরসনে সফল হয়না, তখনও স্বামীর সামনে দুইটি মাত্র বিকল্প অবশিষ্ট থাকে। প্রথমতঃ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য এক নারীকে বিয়ে করা, দ্বিতীয়তঃ সকল আইনানুগ অধিকারসহ তাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখা এবং আরেকটি বিয়ে করা, এখানেও দ্বিতীয় বিকল্পটিই যে প্রথমা স্ত্রীর জন্য অধিকতর সম্মানজনক, স্বামীর জন্য অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ, স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমের অবিচলতা ও নৈতিক মহানুভবতার প্রতীক এবং স্ত্রীর বিশেষতঃ বর্ষীয়সী ও একাধিক সন্তানের জননী একজন মহিলার স্বার্থের অধিকতর নিরাপত্তা দানকারী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

৪. স্বামীকে যদি পেশাগত কারণে অধিক সময় প্রবাসে কাটাতে হয় এবং নিজ শহর ছেড়ে অন্যত্র কোন কোন সময় মাসের পর মাস অবস্থান করতে হয়, অথচ সে প্রত্যেক সফরে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে সাথে নিতে সক্ষম হয়না এবং এতদীর্ঘ সময় একাকী থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ হিসাবে তাকে দুটো বিকল্পের সম্মুখীন হতে হয়ঃ কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই স্ত্রীকে ও তার সাথে মিলনের ফলে জন্ম নেয়া সন্তানদেরকে বৈধ সন্তানদের সমান অধিকার না দেয়া, অথবা বৈধভাবে আর একটি বিয়ে করা, নতুন স্ত্রীর সাথে ধর্মীয় নৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার পেট থেকে জন্ম নেয়া সন্তানদেরকে বৈধ, সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আমার বিশ্বাস যে, ঠাণ্ডামাথাপ্রসূত যুক্তি, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও বাস্তব সমাধান-সব কিছুর আলোকেই প্রথম বিকল্পের চেয়ে দ্বিতীয় বিকল্পটি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

৫. সর্বশেষ সম্ভাব্য অবস্থাটি সম্পর্কে আমি একটু স্পষ্টবাদী না হয়ে পারছিনা। সেটি এইযে, স্বামী এতটা পৌরুষের অধিকারী যে, একজন স্ত্রী তার জন্য যথেষ্ট নয়। এর কারণ স্ত্রীর পৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যও হতে পারে, অথবা তার রোগব্যাধি, রক্তস্রাব বা অনুরূপ অন্য কোন অবস্থাও হতে পারে, যা তাকে যৌন সংগমের উপযোগী থাকতে দেয়না। যদিও এরূপ পরিস্থিতিতেও স্বামীর ধৈর্য ধারণই উত্তম বলে আমি মনে করি, কিন্তু সেটা যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে উপায় কি? এই বাস্তবতাকে কি আমরা উটপাখির মতো চোখ বুজে

www.amarboi.org

উপেক্ষা করতে পারি? অথবা তার জন্য শরীয়ত যে যৌন সম্পর্ককে হারাম করেছে তা কি হালাল করে দিতে পারি? এটা যদি করি, তাহলে তাতে শরীয়ত ও নৈতিকতার বিরুদ্ধাচরণ তো হবেই, উপরন্তু তা হবে স্ত্রী ও তার সন্তানদের ক্ষতি সাধন ও অধিকার হরণের নামান্তর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র সম্মানজনক বিকল্পই অবশিষ্ট থাকে। সেটি হলো, তাকে উভয় স্ত্রীর মর্যাদা, অধিকার এবং সন্তানদের মর্যাদা ও অধিকারের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার কথোপকথনের বিবরণ তুলে ধরা জরুরী মনে করছি।

১৯৫৬ সালে আমি যখন ইউরোপ ভ্রমণ করি, তখন লণ্ডনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এণ্ডারসনের সাথে ইসলামের বহুবিবাহ ব্যবস্থা নিয়ে নিম্নরূপ আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

এণ্ডারসন আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ বহুবিবাহ সম্পর্কে আপনার মত কি?

আমি বললামঃ নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে বাস্তবায়িত করা হলে ব্যবস্থাটা উত্তম এবং তা কোন কোন অবস্থায় সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

এণ্ডারসনঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনি এ ব্যাপারে মুহাম্মদ আবদুহুর ন্যায় শর্ত আরোপের পক্ষপাতি ?

আমিঃ অবিকল তাঁর মত নয়, তবে তাঁর কাছাকাছি। আমি মনে করি, দ্বিতীয় স্ত্রীর ভরণ পোষণের ক্ষমতা থাকা সাপেক্ষে স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে, যাতে ইসলাম স্ত্রীদের মধ্যে যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়, তা পূরণ হয়।

এণ্ডারসনঃ এ যুগে আর কেউ কি আপনার মত বহুবিবাহের পক্ষে ওকালতী করে ?

আমিঃ আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো। সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দেবেন। এক ব্যক্তির একজন স্ত্রী রয়েছে। সেই স্ত্রী এমন সংক্রামক বা ঘৃণার উদ্রেককারী রোগে আক্রান্ত হলো, যার নিরাময় হবার কোন আশা নেই। অথচ পুরুষটি বয়সে যুবক। সে কী করবে? হয় সে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় নতুন কোন নারীকে বিয়ে করবে, অথবা তাকে বহাল রেখেই অন্য বিয়ে করবে, অথবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য কোন নারীর সাথে গোপনে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই তিনটে বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া তার সামনে কি আর কোন পথ খোলা আছে ?

এণ্ডারসনঃ চতুর্থ একটা বিকল্পও তো আছে। সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আমিঃ সব মানুষ কি তা পারে ?

এণ্ডারসনঃ আমরা খৃষ্টানরা ঈমানের বলে এটা করতে পারি।

আমিঃ (মুচকি হেসে) একজন পাশ্চাত্যবাসী হয়ে আপনি এ কথা বলছেন? এ কথাটা কোন মুসলমান বা প্রাচ্য দেশীয় খৃষ্টান বললে সেটা বোধগম্য হতো। সে অবৈধ যৌনতা

www.amarboi.org

থেকে আত্মসংযম করলেও করতে পারে। কেননা তার পরিবেশ তাকে যখন যেখানে ইচ্ছা, নারীর সংসর্গ লাভের সুযোগ দেয়না। তা ছাড়া তার ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধ তার কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তার দেশের ওপর তার ধর্মের প্রভাবও অপরিসীম। পক্ষান্তরে আপনারা পাশ্চাত্যবাসীরা নারীর সংগ লাভ ও অবাধ মেলামেশার সকল সুযোগই দিয়ে রেখেছেন। এমনকি ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত যে টুকু সময় বাইরে কাটান, সে সময় টুকুতেও কোন নারীর সাথে মেলামেশা না করে বা অন্তত দর্শন না করে থাকতে পারেননা। আপনাদের সমাজ নাইট ক্লাব, মদের আসর ও যৌন নাচের আসরে পরিপূর্ণ থাকে। আপনাদের রাস্তাঘাটে অবৈধ সন্তানদের ভীড় জমে থাকে। এহেন সমাজে আপনারা দাবী করেন যে, আপনাদের ধর্ম আপনাদেরকে রুগ্ন স্ত্রীর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেয়না? অথচ পত্রপত্রিকায় এমন খবর অহরহ থাকে যে, যুবতী সুন্দরী সুস্থ স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পুরুষেরা অন্য স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে এবং তা নিয়ে হরহামেশা মামলা মোকদ্দমা ও ঝগড়া ফাসাদ হচ্ছে। এ সব কি মিথ্যে?

এণ্ডারসনঃ আমি আপনাকে শুধু আমার নিজের কথা বলছি। আমি ধৈর্যধারণ ও আত্মসংযম করতে পারি।

আমি ঃ বেশ ভালো কথা। আমি জানতে চাই, পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের মধ্যে আপনার মত সংযমীরা শতকরা কতজন, আর অসংযতরাই বা কতজন ?

এণ্ডারসনঃ অস্বীকার করিনা যে, সংযমীরা সংখ্যায় খুবই কম।

আমিঃ তাহলে আপনি কি মনে করেন, হাতে গনা কয়েকজন লোকের জন্য আইন প্রণীত হয়, না সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার জন্য? যে আইন সীমাবদ্ধ কয়েকজন ছাড়া মেনে চলতে পারেনা, সে আইন দিয়ে সমাজের কী লাভ?

এবার এণ্ডারসন নিরুত্তর হয়ে গেলেন এবং আমার ও তাঁর কথোপকথনের সমাপ্তি ঘটলো।

এই কথোপকথনের মধ্যে আমি আসলে এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, যারা বলেন, যৌন আবেগই জীবনের সবকিছু নয়, বরং স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা ও ধৈর্য ইত্যাকার গুণাবলী অনেক বেশী মূল্যবান, মহৎ মানুষেরা এগুলো লালন করে থাকে, এবং যারা বলেন যে, যৌন প্রয়োজনের ছুঁতো দেখিয়ে বহু বিবাহের ব্যবস্থাকে সমর্থন করা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে ফেলার নামান্তর, তারা খুবই সুন্দর কথা বলে থাকেন। তবে এসব নিছক, অবান্তর কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথা এই সভ্যতাকে ঘিরে এবং এই সভ্যতার কোলে লালিত মানুষকে ঘিরে মোটেই শোভনীয় নয় সমাজের সবাই যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী মহৎ ও সাধু সজ্জন হতো, এবং সবাই আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস ও কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতো, তবেই এ কথা মানানসই হতো। মানব জাতি যে বাস্তব পরিস্থিতিতে জীবন ধারণ করছে, তাকে অবশ্যই আমল দিতে হবে এবং বাস্তববাদী হয়ে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার সাথে সমস্যার মুকাবিলা করতে হবে।

www.amarboi.org

এ প্রসংগে আরো একটি প্রশ্নের সমাধান করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। সেটি এইযে, এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ যেমন পুরুষের জন্য বৈধ, তেমনি স্ত্রীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ বৈধ নয় কেন! এর জবাব এই যে, বহু বিবাহের প্রশ্নে নারী ও পুরুষকে সমানাধিকার দেয়া স্বাভাবিকভাবেই এবং সৃষ্টিগতভাবেই অসম্ভব। নারীরা স্বভাবতই একই সময়ে গর্ভধারণ করে এবং পুরো বছরে একবারই করে। পক্ষান্তরে পুরুষের ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। সে একই সময়ে ও একই বছরে একাধিক নারীকে অন্তসত্তা করে দিতে সক্ষম। অথচ নারীর পক্ষে একই পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে একটি মাত্র সন্তান প্রজনন করা সম্ভব। কাজেই নারীকে যদি একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে তার সন্তান কোন পুরুষের বংশধর বা সন্তান, তা নির্ণয় করা যেতনা। অথচ পুরুষকে বহু বিবাহের অনুমতি দিলে এই সমস্যা দেখা দেয়না।

তাছাড়া পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে পরিবার প্রধান হিসাবে পুরুষই স্বীকৃত। একাধিক স্বামীর অনুমতি দিলে পরিবারের প্রধান কিভাবে নির্ণিত হতো? বয়োজ্যেষ্ঠতা দ্বারা, না পালাক্রমে? আর স্ত্রী কার আনুগত্য করতো? এক সাথে সকলের না নির্দিষ্ট একজনের? এক সাথে সকলের তো হতেই পারেনা। কেননা সকলে এ ব্যাপারে সমান আগ্রহী হতো। সুতরাং একাধিক স্বামীর ব্যবস্থা কোন সভ্য সমাজে কার্যোপযোগী হতে পারেনা।

বহু বিবাহের কুফল

বহু বিবাহের সুফলগুলো উল্লেখ করার পর ন্যায়বিচারের দাবী এই যে, বহু বিবাহের কুফলগুলোও উল্লেখ করা উচিত। এই কুফলগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সবচেয়ে গুরুতর কুফল এই যে, সতিনদের মধ্যে হিংসা, প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের মনোভাব এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, তা দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, সতীনদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি দূর হয়ে যায়।

এই ভাষণটি তৈরী করার সময় এ সম্পর্কে মরহুম শেখ আবদুল্লাহ আল ইলমী আদ দামেস্কীর কয়েক লাইন কবিতার সন্ধান পেয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর লেখা সূরা ইউসুফের তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। দুই স্ত্রীর কোন্দলে স্বামীর কী করুণ দশা হয়ে থাকে, তা এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লাইন কটি এরূপ ঃ

"দুই নারীকে বিয়ে করে মস্ত বড় মূর্খতার কাজ করে ফেলেছি, দুই স্ত্রীর স্বামী যে এত কঠিন পরীক্ষায় পড়ে, তা জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম ওদের দু'জনের মাঝে পরম সুখে দীর্ঘ জীবন কাটাতে পারবো, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত ঘটেছে।

ওরা দু'জন আমার জন্য দুটো স্থায়ী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজনকে খুশী করলে আর একজন হয় মহা খাপ্পা, ফলে আমাকে সব সময় একজন না একজনের কোপানলে থাকতে হয়।"

সবচেয়ে বিপদজ্জনক অবস্থা দেখা দেয় তখন, যখন একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্বামীর অপেক্ষাকৃত বেশী ভালোবাসার পাত্রী হয়। তখন হিংসা বিদ্বেষের কোন সীমা

www.amarboi.org

পরিসীমা থাকেনা। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বামীর পর্যাপ্ত বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞজনোচিত আচরণ দ্বারাই পরিস্থিতিকে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতে পারে। নবীদের মত স্বভাব চরিত্র এবং বিজ্ঞজনদের ন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলেই স্বামীর পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব। তবে অত উচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণতা ও ন্যায় বিচার খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়।

২. সতিনদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সন্তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে থাকে। সৎ ভাইয়েরা এই পরিবেশে বড় হতে হতে তাদের ভেতরে হিংসা বিদ্বেষও ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে গোটা পরিবারের জন্য কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। আর এই পরিস্থিতির সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ে পিতার ওপর। যার পরিণামে পরিবারের সুখশান্তি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

৩. খোরপোশ ও আচার ব্যবহারে ন্যায় বিচার বজায় রাখার জন্য স্বামী যতই আগ্রহী, আন্তরিক ও সচেষ্ট থাকনা কেন, ভালোবাসার ব্যাপারে ন্যায় বিচার করা কোন স্বামীর পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ আল-কুরআনে এ কথা জানিয়েছেন। নতুন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মাত্রারিক্ত ঝোঁক দেখে প্রথমা স্ত্রীর মনে মনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সে তার নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারেনা। অথচ ভালোবাসা ভাগাভাগি করা খুবই কঠিন এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতাও অসহনীয়।

৪. কিশোর ও তরুণদের বখাটেপনা বহু বিবাহের আরো একটা কুফল বলে অনেকের ধারণা। তালাকের বেলায়ও অনেকে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু বখাটেপনার কারণ ও স্থান সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই বক্তব্যটা সঠিক নয়। আমাদের দেশে সাধারণত গ্রামাঞ্চলেই বহু বিবাহের ঘটনাবলী ঘটে থাকে। এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই যে, অনেকগুলো পুত্রসন্তান হলে তারা পিতাকে কৃষি কাজে সহায়তা করতে পারবে। সাধারণত বিত্তশালী গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রেই এটা হয়ে থাকে। অথচ গ্রামাঞ্চলে বখাটেপনা নেই। ধনিক পরিবারের ছেলেদের মধ্যেও এই প্রবণতা কম। এ প্রবণতা প্রধানত বড় বড় শহরে, দরিদ্র পরিবারের সন্তান, ভবঘুরে ও অপরাধী লোকদের সন্তান এবং পিতৃমাতৃহীন ছেলেদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। সুতরাং বখাটেপনা ও ভবঘুরেপনার কারণ শুধু বহু বিবাহও নয়, শুধু তালাকও নয়, বরং এর আরো বহু সুনির্দিষ্ট সামাজিক কারণ রয়েছে।

সুতরাং বহু বিবাহেরর কুফল হিসাবে কেবল প্রথম তিনটেই গ্রহণযোগ্য। তবে প্রশ্ন জাগে এই যে, দুনিয়ায় আর কোন্ ব্যবস্থাটি এমন আছে, যার কোন কুফল নেই? পৃথিবীতে এমন কোন্ বিষয় আছে, যা মানুষের খেয়াল খুশীমত সংঘটিত হয়ে থাকে? বস্তুত যথার্থ ধর্মপরায়ণতা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দ্বারা এই সমস্ত কুফল বা ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে লাঘব করা যেতে পারে, এমনকি তার প্রায় বিলোপ সাধনও সম্ভবপর হতে পারে।

www.amarboi.org

এ কথা সবাই জানে যে, একাধিক বিয়ে নিছক সখের বশে করা খুবই বিরল ঘটনা। যে করে, সে নেহাত দায়ে ঠেকেই করে। এই দায়ে ঠেকা তথা অনিবার্য পরিস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র নিয়মবিধি থাকে। আমার মতে এ জিনিসটাকে যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যুদ্ধ অকল্পনীয় ও অসহনীয় দুঃখকষ্ট ও বহু বিয়োগান্ত ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে। তাই সাধ করে কেউ যুদ্ধ বাধায়না। আবার যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন তাতে অংশ গ্রহণ না করেও উপায় থাকেনা। ওটা তখন হয়ে দাঁড়ায় আইনসংগত আত্মরক্ষা কার্যক্রম। এর জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করা যায় এবং সব রকম ত্যাগ স্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন না হলে যুদ্ধ একটা পাগলামী মাত্র। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটা করতে চাইবেনা। বহু বিবাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক সমাজের এটাই একমাত্র নীতি ও ভূমিকা হওয়া উচিত।

তাছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে প্রথমা স্ত্রীর যত মনোকষ্ট হোক, তা তাকে একাধিক বিয়ে থেকে বিরত রাখার জন্য যুক্তি হিসাবেও যথেষ্ট নয়। স্বামী যদি অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েই পড়ে, তবে তার স্ত্রী কিভাবে তা ঠেকাবে? স্বামীটি তো তার অজান্তেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তার সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন ও বসবাস পর্যন্ত করতে পারে। সব কিছু জেনেও তার কিছুই করার থাকেনা। পাশ্চাত্যে এটা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমাদের দেশেও অনেক বিকৃত চরিত্রের লোকদের এ ধরনের প্রবণতা আছে। এ ক্ষেত্রে এই মেলামেশাটাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মুতাবিক তাকে বৈধ করতে দেয়াই কি স্বামী স্ত্রীর উভয়ের জন্য অধিকতর সম্মানজনক নয়?

যে স্বামী এক স্ত্রীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে অথচ স্ত্রীকে ভালোবাসেনা, তার এ আচরণও কি স্ত্রীর জন্য কষ্টদায়ক নয়? তাদের জীবন কি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেনা? তাদের দাম্পত্য জীবনে কি সুখ-শান্তির নামগন্ধও থাকে? অথচ তার কীইবা করার থাকে? সে কি তাকে ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারে? এটা অসম্ভব। তাকে কি ঘরে আটকে রাখতে পারবে? অথবা তাবিজতুমার দিয়ে তাকে বশীভূত করতে পারবে? না, এর কোনটাই পারবোনা। ভালোবাসায় যেমন বাধা দেয়া যায় না, তেমনি তা জোর করেও আদায় করা যায়না। তাই কোন স্ত্রীর যখন এমন স্বামী জোটে, যে তাকে ভালোবাসেনা, তখন বুঝে নিতে হবে যে, ওটা তার কপালের লিখন। আর এ জন্য তার যে মনোকষ্ট হয়, সেটা দূর করার কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তার সামনে দুটো পথই খোলা থাকে। হয় সে, তালাকের মাধ্যমে স্বামীকে পুরোপুরি হারিয়ে বসুক, অথবা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তার অর্ধেকটা হারিয়ে সন্তুষ্ট থাকুক। এর মধ্যে কোন্‌টি অধিক ক্ষতিকর ও অধিক কষ্টদায়ক, তা সহজেই বোধগম্য।

www.amarboi.org

বহু বিবাহ একটা নৈতিক ও মানবিক ব্যবস্থা

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বহুবিবাহ বিশেষত তা যদি ইসলামী বিধিব্যবস্থার আওতাধীন সংঘটিত হয়, তবে তা একাধারে একটা চকমপ্রদ নৈতিক এবং মানবিক ব্যবস্থা। নৈতিক ব্যবস্থা এই জন্য যে, এটা পুরুষের যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন স্থানে অবাধে মেলামেশার পথ রোধ করে। আর প্রথমা স্ত্রীর পর আর মাত্র তিনজন নারীর সাথে বৈবাহিত সম্পর্ক রাখা তার জন্য বৈধ থাকে-এর বেশী নয়।

কোন বেগানা মহিলার সাথে সে গোপনে মিলিত হতে বা গোপন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা। এটা করতে হলে তাকে অন্তত দু'জন সাক্ষীর সামনে বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ও তার ঘোষণা দিতে হবে। এই চুক্তির কথা ঐ মহিলার অভিভাবককে জানাতে ও তাদের সম্মতি নিতে হবে। তারা কোন আপত্তি প্রকাশ না করে এটা নিশ্চিত করতে হবে এবং আধুনিক নিয়মবিধি অনুসারে তা উপযুক্ত কার্যালয়ে রেজিস্ট্রী করাতে হবে। সেই সাথে অধিকতর মর্যাদা ও আনন্দ লাভের জন্য ওলীমা বা বৌভাত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করে বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিলে আরো উত্তম হয়।

এ ব্যবস্থাটা মানবিক এ জন্য যে, এ দ্বারা একজন পুরুষ এক স্বামীহীন মহিলাকে আশ্রয় দিয়ে সমাজের একটা বোঝা হালকা করে এবং তাকে তার সেই সব স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যাদের মানসম্ভ্রমসহ যাবতীয় অধিকার সংরক্ষিত। তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে তাকে সে মোহরানা, খোরপোষ ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়ে এমন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যা জাতিকে একটি কর্মক্ষম নব প্রজন্ম উপহার দেয়। সম্পর্ক স্থাপনের পর তার গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের কষ্টকর মুহূর্তে তার কাছ থেকে দায় এড়িয়ে ছিটকে পড়েনা, বরং তার যাবতীয় কষ্ট ভাগাভাগি করে নেয় এবং গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সময় তাকে তার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রদান করে। তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর যে সন্তান জন্মে, সে তাদের পিতৃত্ব স্বীকার করে এবং পবিত্র ভালোবাসার ফল হিসাবে তাদেরকে সমাজের হাতে অর্পণ করে।

বস্তুত বহু বিবাহ একদিকে মানুষের যৌন স্বেচ্ছাচারিতাকে সীমিত করে, অপরদিকে তার দায়দায়িত্বকে সীমাহীন করে দেয়।

তাই চরিত্রের হেফাজত করে বিধায় বহুবিবাহ একটি নৈতিক ব্যবস্থা, আর মানবতার মর্যাদা সমুন্নত করে বিধায় তা একটা মানবিক ব্যবস্থা।

পাশ্চাত্যবাসীর বহুগামীতা নৈতিকও নয়, মানবিকও নয়

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যবাসীর বহুগামীতা ঠিক এর বিপরীত। এজন্য তাদের মধ্যকার জনৈক লেখক তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, তোমাদের সমাজে এমন একজন মানুষও যদি থেকে থাকে তবে আমাকে দেখাও যে, মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় কোন যাজকের কাছে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করবে যে, সে নিজের স্ত্রী ছাড়া জীবনে আর কখনো কোন একজন মহিলার সাথে একটি বারের জন্যও মিলিত হয়নি।

www.amarboi.org

পাশ্চাত্যবাসীর জীবনে এই বহুগামীতা কোন আইনগত বৈধতা ছাড়াই চালু রয়েছে এবং তা আইনরক্ষকদের জ্ঞাতসারেই চালু রয়েছে। এই বহুগামীতা তারা বিয়ে ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সংগিনীদেরকে তারা স্ত্রীর পরিবর্তে বান্ধবী বলে অভিহিত করে থাকে। আর তাদের সংখ্যাও চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং অগণিত। এটা প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়না এবং পরিবারে তা নিয়ে কোন আনন্দোৎসবও হয়না। এটা সংঘটিত হয় গোপনে এবং সবার অজান্তে। এতে পুরুষকে তার সংগিনী বা বান্ধবীর কোন অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়না। সে কেবল তার সম্ভ্রমটা নষ্ট করে একটা অবৈধ সন্তানের দায় ও কলংকের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে সমাজের গলগ্রহ বানিয়েই ছেড়ে দেয়। এমনকি এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে সন্তান জন্মে, সংশ্লিষ্ট পুরুষটি তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়না, বরং ঐ সন্তানটিকে সমাজে যারজ সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়। সে যতদিন বেঁচে থাকে, ললাটে ব্যভিচারের নিদর্শন বহন করেই বেঁচে থাকে এবং কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। (অবশ্য কেউ কেউ এই কলংককে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে খ্যাতি অর্জনের জন্য কৃত্রিম সাহস সঞ্চয় করে সমাজে কিছু অবদান রাখতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারসাম্য হারিয়ে খ্যাতির পরিবর্তে কুখ্যাতি অর্জন করে এবং দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে, যেমন হিটলার।- অনুবাদক)

এই সীমাহীন অবৈধ সম্পর্ককে বহুবিবাহ নামে অভিহিত না করে, তাকে আইনের দৃষ্টিতে জায়েজ করে নেয়া হয়েছে। অথচ এর পেছনে কোন নৈতিক চেতনা ও মানবিক অনুভূতি নেই। নিরেট যৌন লালসা ও তার জন্য কোন দায়দায়িত্ব বহন না করার মনোবৃত্তিই এর জন্য এককভাবে দায়ী।

এখন এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিকতর নৈতিকতা সম্মত, নারীর জন্য অধিকতর সম্মানজনক, অধিকতর মানবিক ও অধিকতর প্রগতির সহায়ক, তার ফায়সালা করা যে কোন সুস্থ বিবেকের পক্ষে সহজ; ইসলাম, না পাশ্চাত্যের এই লাগামহীন স্বেচ্ছাচার?

ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের অপপ্রচার

পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহুবিবাহ নিয়ে যে উন্মত্ত অপপ্রচারণায় মেতে উঠেছে, তাতে এখন পাঠক মাত্রেই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না এবং সংগতভাবেই তাদের কাছে নিম্নের প্রশ্নগুলো তুলতে পারেনঃ

ইসলামকে দোষারোপ করে তারা যে অপপ্রচারের তাণ্ডব তুলেছে, তার পেছনে যে আদৌ কোন যুক্তি নেই সেটা কি তারা অনুধাবন করবেনা?

- ব্যভিচারের আধিক্যহেতু পরিবারগুলোর ভেঙ্গে পড়া ও অবৈধ সন্তানদের ব্যাপক প্রসারের দৃশ্য দেখেও কি তারা অনুভব ও স্বীকার করবেনা যে, এক স্ত্রী তাদের জন্য যথেষ্ট নয় ?
- যে ব্যক্তি চার বিয়ে করে, সে যে প্রতি রাত্রে একজন নতুন উপপত্নীর বাসরে মিলিত হওয়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, তা কি তাদের বিবেক মেনে নেয়না ?

www.amarboi.org

- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহন করে মিলিত হয়, সে যে তার কোন দায়দায়িত্ব বহন না করে তার মাতৃত্ব হরণকারীর চেয়ে ভদ্র ও মহৎ, তা তারা কোন কারণে স্বীকার করবেনা ?
- তারা কি এই সহজ সত্যটুকুও বোঝেনা যে, সমাজে ফি বছর লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্ম গ্রহণের চাইতে একই সংখ্যক বা তার চেয়ে কমবেশী বৈধ সন্তান জন্ম নেয়া অনেক ভালো ও সম্মানজনক ?

আমার ধারণা এইযে, তারা যদি ইসলামের প্রতি তাদের আজন্ম লালিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং নিজেদের সবকিছুকে নির্বিচারে ভালো ও অন্যদের সব কিছুকে নির্বিচারে খারাপ মনে করার নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করে, তাহলে তারা উল্লেখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবেই অনুধাবন করতে পারবে।

১৯৫৬ সালে আমি যখন ডাবলিনে (আয়ারল্যাণ্ডে) ছিলাম, তখন সেখানে পাত্রীদের একটি সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করি এবং সেখানে উক্ত সমিতির সভাপতির সাথে আমার নিম্নরূপ কথোপকথন হয়ঃ

আমি বললামঃ আজকের যুগে যখন জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা ও সমঝোতার সূচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সংযোগ ও সমন্বয়ের আন্তর্জাতিক চেষ্টা চলছে, তখন আপনারা পাঠ্যপুস্তকে পর্যন্ত ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

তিনি জবাব দিলেনঃ সত্যি বলতে কি, আমরা পাশ্চাত্যবাসী এমন এমন ব্যক্তিকে সম্মান করতে পারিনে, যিনি নয় নয়টি বিয়ে করেছেন।

আমি বললামঃ আল্লাহর নবী দাউদ ও সুলায়মানকে কি আপনারা শ্রদ্ধা করেন ?

তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই। তাঁরা তো তাওরাতের বিশিষ্ট নবী।

আমি বললামঃ আল্লাহর নবী দাউদ (আ:) এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। পরে নিজ সেনাপতি উরিয়ার স্ত্রীকে বিয়ে করে তিনি একশো পূর্ণ করলেন। এটা তো জানা কথা। আর তাওরাতে আছে যে, আল্লাহর নবী সুলায়মানের সাতশো স্ত্রী ও তিনশো দাসী ছিল এবং তারা সবাই ছিল তৎকালের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী। যে বক্তি এক হাজার স্ত্রীর স্বামী তাকে আপনারা সম্মান করতে পারেন, আর মাত্র নয় স্ত্রীর স্বামীকে (মুহাম্মদ (সা)) সম্মান করতে পারেন না কেন? অথচ এই নয়জন স্ত্রীর মধ্যে ৮ জনই বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। একাধিক সন্তানের জননী, এমন কি কেউ কেউ তো একেবারেই বুড়ী থুড় থুড়ি। আর নবম স্ত্রী হচ্ছেন একমাত্র কুমারী যুবতী।

এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাদ্রী বললেনঃ আসলে আমি আপনাকে কথাটা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারিনি। আমি বলতে চেয়েছি এই যে, আসলে আমরা পাশ্চাত্যবাসী একাধিক স্ত্রীকে বিয়ে করাটা ভালো মনে করিনা। যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করে, তাকে আমাদের কাছে একটু উদ্ভট প্রকৃতির অথচ বেশী কামুক লোক মনে হয়।

www.amarboi.org

আমি বললামঃ তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ, সুলায়মান এবং হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে সকল ইসরাইলী নবী, যারা একাধিক বিয়ে করেছেন, তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

এ প্রশ্নে তিনি সম্পূর্ণ নীরব রইলেন এবং কোনই জবাব দিতে পারলেন না।

পবিত্র আল কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি

পবিত্র আল কুরআনে সূরা আন্ নিসার প্রথম দিকে আল্লাহ বলেনঃ "যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে দুটো করে, তিনটে করে ও চারটে করে বিয়ে কর। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটিই বিয়ে কর অথবা দাসী রাখ। এটাই সন্তানদের সংখ্যা সীমিত রাখার সবচেয়ে সহজ পন্থা।" (আয়াত-৩)

একই সূরার ১২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "তোমাদের প্রবল আগ্রহ থাকলেও স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা। কাজেই একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়োনা, যার ফলে আর একজনকে ঝুলন্ত রেখে দেবে। যদি তোমরা সমঝোতা প্রিয় ও সংযমী হও, তাহলে আল্লাহই দয়ালু ও ক্ষমাশীল।"

স্বয়ং রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় সাধারণ মুসলমান ও সাহাবীগণ এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ীগণ ও ইজতিহাদ যুগের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ এ দুটি আয়াতের যে অর্থ বুঝেছেন, সে অনুসারে আয়াত দুটি থেকে নিম্নোক্ত বিধিসমূহ জানা যায়ঃ

১. চারটি পর্যন্ত একাধিক বিয়ের দ্ব্যর্থহীন অনুমতি। এখানে "বিয়ে কর" কথাটা আদেশবাচক হলেও এর অর্থ এটা নয় যে, একাধিক বিয়ে করতেই হবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো "বিয়ে করতে পার"। এ ব্যাপারে সকল যুগের ইমামদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য ছিল এবং রয়েছে। কারো ভিন্নমতের কথা এ ব্যাপারে কখনো শোনা যায়নি।

এই সর্ববাদী সম্মত বিধির বিরুদ্ধাচারণ করে কিছু বিদয়াতপন্থী ও স্বেচ্ছাচারী লোক যে প্রচার করে থাকে যে, এ আয়াতে চারটের বেশী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল কুরআনের ভাষাগত অলংকার আরবী ভাষার বাচনভংগী ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞাতবশতই তারা এরূপ বলে থাকে। একথা ইমাম কুরতুবী বলেছেন।

২. একাধিক বিয়ে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচারের শর্তাধীন। যে ব্যক্তি নিশ্চিত নয় যে, সে তার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে তার পক্ষে একাধিক বিয়ে করা গুনাহ। এতদসত্ত্বেও কেউ চারটে পর্যন্ত বিয়ে করলে বিয়ে তো বৈধ হবে। কিন্তু সে গুনাহগার হবে।

ইমামগণ এব্যাপারে একমত এবং রাসূল (সা) এর উক্তি ও বাস্তব কার্যক্রম তা সমর্থনও করে যে, এখানে যে ন্যায়বিচারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার দ্বারা খাদ্য ,বস্ত্র,

www.amarboi.org

বাসস্থান, রাত্রিযাপন এবং স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে যে আচরণে ন্যায়বিচার সম্ভব, সেই সব বিষয়ে ও আচরণে বাস্তব ন্যায়বিচার বোঝানো হয়েছে।

৩. প্রথম আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সম্ভাব্য সন্তানদের ভরণপোষণের সামর্থ থাকাও দ্বিতীয় বিয়ের অন্যতম শর্ত। তবে ইমাম বায়হাকীর মতে এটি একটি নৈতিক শর্ত- অইনগত নয়। অর্থাৎ এ শর্তের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করা সাধ্যাতীত। তাই স্বামীর কর্তব্য শুধু এতটুকু যে, সে যেন একজনের প্রতি সর্বতোভাবে ঝুঁকে না পড়ে এবং আর একজনকে এমন ঝুলন্ত করে না রাখে যেন সে স্ত্রীও নয়, তালাকপ্রাপ্তাও নয়। বরঞ্চ অপর জনের সাথে যথাসাধ্য কোমলতা দরদী আচরণ করা উচিত। এতে আশা করা যায় যে, তার মনের খেদ কিছুটা প্রশমিত হবে এবং স্বামী তার ভালোবাসাও পাবে।

রাসূল (সা) এ আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার সম্মত আচরণ করার পর বলতেনঃ "হে আল্লাহ, যে বিষয়ে সুবিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব সে ব্যাপারে যতটুকু পারি সুবিচার করলাম। আর যে বিষয়ে সুবিচার করা আমার অসাধ্য সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন না।" এ দ্বারা তিনি অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা হযরত আয়েশার প্রতি নিজের বেশী ভালোবাসার প্রতিই ইংগিত দিয়েছেন।

ভ্রান্ত ধারণা

আল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ এরূপ ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, আল কুরআন প্রথম দুটি আয়াতে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা প্রথম আয়াতে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় বিচারের শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার কখনো সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা একাধিক বিয়ের জন্য একটা অসম্ভব জিনিসের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ।

সামান্য একটু বিচার বিবেচনা দ্বারাই এই দাবীর ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ যে ন্যায়বিচারের শর্ত প্রথম আয়াতে আরোপ করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত অসম্ভব ন্যায় বিচার নয়। প্রথম আয়াতে যে ন্যায় বিচারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই ন্যায়বিচার, যা স্বামীর পক্ষে করা সম্ভব। এ ন্যায়বিচার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, রাত্রিযাপন প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুগত ন্যায়বিচার।

আর যে ন্যায়বিচারকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে স্বামীর পক্ষে যা বাস্তবিক পক্ষেই সম্ভব নয় সেই ন্যায়বিচার। এটি হলো ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সংক্রান্ত মনস্তাত্বিক ন্যায়বিচার। এটা সুনিশ্চিত ব্যাপার যে, প্রথমা স্ত্রীর প্রতি কোন না কোন কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ দ্বিতীয় বিয়ে করেনা। কাজেই প্রথমা স্ত্রীর সাথে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার ব্যাপারে ন্যায় বিচার সে কিভাবে করতে পারে?

www.amarboi.org

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এই দুটি আয়াতে যে ন্যায় বিচারের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধরনের ন্যায় বিচার। প্রথমোক্ত আয়াতে শর্ত আরোপ করা হয়েছে বস্তুগত ন্যায়বিচারের। আর শেষোক্ত আয়াতে অসম্ভব ঘোষণা করা হয়েছে ভালোবাসার ন্যায়বিচারকে। কাজেই বস্তুগত ন্যায় বিচারের শর্ত সর্বদাই বহাল আছে এবং থাকবে। যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা জেনেও একাধিক বিয়ে করে, সে গুনাহগার হবে। আর, বিয়ে করার পর সুবিচার না করলে তো গুনাহ হবেই। কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে সুবিচার না করলে আল্লাহ সে জন্য পাকড়াও করবেন না। তবে হ্যাঁ, অতিমাত্রায় বৈষম্য, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করলে নিশ্চয়ই পাকড়াও করবেন।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় আয়াতে যে ন্যায় বিচারের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ভালোবাসা সংক্রান্ত ন্যায়বিচার, যা মানুষের অসাধ্য। যেহেতু আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের প্রকৃতি ও স্বভাব জানেন, এবং এও জানেন যে, সে প্রথমা স্ত্রী ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার ন্যায়সংগত বন্টন করতে অক্ষম, তাই যেটি তার পক্ষে সম্ভব, সেটি সম্পর্কে তাকে বিধান দিয়েছেন। প্রথমা স্ত্রীকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তাকে ঝুলন্ত করে রাখতে তাকে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ স্পষ্টতই এইযে, কিছুটা উপেক্ষা তো বৈধ এবং তা অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ টুকুর জন্য আল্লাহ স্বামীর কাছ থেকে হিসাব নেবেন না। তাই আয়াতটির উপসংহারে আল্লাহ বলেন "তোমরা যদি সমঝোতা প্রিয় ও সংযমী হও, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

এভাবে আল্লাহ প্রথমা স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে ও তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তাকে কোনঠাসা করে রাখতে ও তার সাথে দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। এতটুকু সংযম ও সাবধানতা যদি সে অবলম্বন করে, তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথমা স্ত্রীর অপেক্ষা বেশী ভালোবাসার জন্য স্বামীকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ দয়াশীল হবেন এবং তার স্বামীকে তিনি প্রথমা স্ত্রীর প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ ও সদ্ব্যবহার করার প্রেরণা ও তাওফীক দান করবেন।

তৃতীয়তঃ এ দুটি আয়াত দ্বারা যদি আল্লাহ একাধিক বিয়ে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিতেন, তাহলে এ উক্তির কোন অর্থ থাকতোনা যে, "তাহলে তোমাদের যেমন মন চায়, দুটো করে, তিনটে করে, বা চারটে করে বিয়ে কর।" তেমনটি হলে এ বক্তব্য দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতোনা। যদি প্রকৃত পক্ষে সেটাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহ সরাসরি একটিমাত্র শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেই তা নিষিদ্ধ করতে পারতেন। বহুবিবাহের তিনি অনুমতিও দেবেন, আবার তার জন্য একটা অসম্ভব শর্তও আরোপ করবেন-এটা হতে পারেনা। এটা করলে তাঁর কথা একটা বেহুদা কথায় পরিণত হতো। এমন বেহুদা ও নিরর্থক কথা যখন একজন সাধারণ জ্ঞানী লোকও বলেনা, তখন বিশ্বজগতের প্রতিপালক কেমন করে তা বলতে পারেন, যিনি সর্বোচ্চ মানের অলংকার সমৃদ্ধ ও নির্ভুল কথা বলে থাকেন?

www.amarboi.org

এ ধরনের উক্তি শুধু সেই ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যে বলেঃ "তোমার জন্য একাধিক পথ বৈধ করে দিলাম, তবে একটা পথ ছাড়া আর কোন পথে চলা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। একটু ভেবে দেখুনতো, এ ধরনের কথা বলার অর্থ কী দাঁড়ায় ?

এ ধরনের উক্তির স্বার্থকতাই বা কী? কোন আইন, বিধি, সংবিধান বা কোন জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকেই কি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে? মহান বিশ্ব প্রতিপালকের রচিত গ্রন্থের তো প্রশ্নই ওঠেনা।

চতুর্থতঃ ইসলামে এ কথা সুবিদিত যে, রাসূল (সা) আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দাতা, তিনি কোন হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করতেও পারেন না, তার অনুমতিও দিতে পারেন না, সমর্থন ও করতে পারেন না। একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আরবদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকেরই চারের অধিক স্ত্রী ছিল। কারো ছিল ছয়জন, কারো ছিল আটজন, কারো দশজন, এমনকি কারো আঠারো বা তদুর্ধ সংখ্যক পর্যন্ত স্ত্রী ছিল। রাসূল (সা) তাদের সকলকে চারজন রেখে বাদবাকী সবাইকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

এটাও প্রমাণিত সত্য যে, রাসূল (সা) স্বয়ং একাধিক বিয়ে করেছেন, সাহাবাদেরও অনেকে একাধিক বিয়ে করেছেন এবং সে কথা রাসূল (সা) জানতেন। কিন্তু তিনি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। একমাত্র রাসূল (সা) এর জন্য চারের অধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। আর সকল মুসলমানদের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি ছিল। তা নাহলে তিনি কিভাবে সাহাবীদের একাধিক বিয়ে অনুমোদন করলেন এবং সে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন ?

আমি কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে পারিনা যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও সাধারণ মুসলমানগণ চৌদ্দশত বছর ধরে এই দুটো আয়াতের অর্থ নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন না, এবং আল্লাহ এই বুঝ কেবলমাত্র একাধিক বিয়ের বিরোধীদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেদিলেন! যে ব্যক্তি এমন দাবী করে, সে আসলে নিজের মস্তিস্ক বিকৃতির কথাই ঘোষণা করে।

আমার বিশ্বাস, যারা এ সব কথা বলে থাকে, তারা এত অজ্ঞ ও নির্বোধ নয়। তারা আসলে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত! এক শ্রেণী অতিমাত্রায় সরল ও সদুদ্দেশ্য প্রবণ। তারা ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার ওপর পাশ্চাত্যবাসীর আক্রমণের প্রবণতা দেখে মনে করেছে যে, আল কুরআনে বহুবিবাহের স্বীকৃতি নেই বললেই ইসলাম পাশ্চাত্যবাসীর অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। দুর্বল ঈমান ও দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকেরা, যারা নিজেদের আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ নয় এবং অন্যদের মতামতকে ভয় পায়, তারাও এই শ্রেণীর মতই। তারা প্রতিপক্ষের প্রথম আক্রমণেই ধরাশায়ী হয়ে যায়। আমি মনে করি, এই ধরনের লোকদের যুগ শেষ হয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। তারা মুসলমানদেরকে ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে

www.amarboi.org

ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তাই তাদের রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম এবং চৌদ্দশো বছরব্যাপী মুসলমানগণ যা করে আসছেন, তা থেকে তাদেরকে এই বলে দূরে ঠেলে দিতে চায় যে, আগেকার লোকেরা আল কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, তাই তাদের মত ও পথ এড়িয়ে চলাই উত্তম। তবে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই এই নির্লজ্জ শ্রেণীটি মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে সক্ষম হবেনা। কেননা মুসলমানরা তাদের দীনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং তাদের শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান। তাদের এ বিকৃত ধ্যান ধারণা মুসলমানরা কখনো গ্রহণ করবেনা।

বহু বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের সংস্কারের সুফল

ইসলাম যখন দুনিয়ায় এলো, তখন বহুবিবাহ প্রথা দুনিয়ার সকল দেশে ও সকল আইনে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কিন্তু তার কোন সীমা সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলনা।

এ প্রথাকে ইসলাম সর্ব প্রথম সংশোধন করে এবং তাকে চারের মধ্যে সীমিত করে। ইতিপূর্বে যেখানে কারো কারো এমনকি অতীতের কোন নবীর পর্যন্ত শত শত স্ত্রী থাকতো, সেখানে শেষ নবীর মাধ্যমে ইসলামের আনিত এই সংস্কার সত্যিই তার এক বিরাট অবদান।

ইসলাম স্ত্রীদের মধ্যে বস্তুগত ন্যায়বিচার যথাসাধ্য নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। মুসলিম ফকীহগণ এই মূলনীতির আলোকে যে সব বিধি প্রণয়ন করেছেন, তা নৈতিক দিক দিয়ে এত উচ্চ মানের যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণীজনরা তা কল্পনাও করতে পারেনা।

এ ব্যাপারে খোদ রাসূল (সা) মরণব্যাধিতে আক্রান্ত থাকা অবস্থায়ও যে বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন!

তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে এক এক রাত করে কাটাতেন। কিন্তু তাঁর রোগ যখন প্রবল আকার ধারণ করলো এবং হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়লেন, তখন তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে ধরাধরি করে এক স্ত্রীর বাসা থেকে আর এক স্ত্রীর বাসায় নিয়ে যাওয়া হতো। যখন তার রোগ চরম আকার ধারণ করলো, তখন তিনি আয়েশার ঘরে থাকার জন্য অন্য সকল স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাইলেন, যাতে তিনি তাঁর পরিচর্যা করতে পারেন। (সম্ভবত অল্পবয়স্কা ও সন্তানাদির ভারমুক্ত থাকার কারণে) তারা সবাই যখন অনুমতি দিলেন এবং রাসূল (সা) জানতে পারলেন যে, তারা খুশী মনেই অনুমতি দিয়েছেন, তখন হযরত আয়েশার গৃহে গেলেন এবং এর কয়েকদিন পর সেখানে থাকা অবস্থায়ই ইন্তিকাল করলেন।

এই দৃষ্টান্ত বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের মানবিকতা, নৈতিকতা ও মহানুভবতার যেরূপ প্রতিফলন ঘটিয়েছে, আমার জানা মতে এর চেয়ে চমৎকার প্রতিফলন আর কোন কিছুতে ঘটেনি।

www.amarboi.org

এ ক্ষেত্রে ইসলামের সাধিত আর একটি সংস্কার এই যে, সে মুসলিম স্বামীর বিবেককে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ধ্যান, আল্লাহর, আদেশ পালনে পুরস্কার লাভের আশা, এবং তার আদেশ লংঘনে শাস্তি লাভের ভীতি পোষণের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ও অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এ কারণেই মুসলিম স্বামী তার সাথে স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারীর মত আচরণ করেনা, বরং সব সময় নিজের মন ও বিবেকের ওপর নিজের ঈমানের আলোকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যাতে তার হাতে কোন স্ত্রীর অধিকার ক্ষুন্ন না হয় কিংবা কেউ দুর্ব্যবহারের শিকার না হয়।

এই প্রশিক্ষণের কল্যাণেই ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে প্রচলিত বহুবিবাহের ক্ষতি ও কুফলকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে ও স্বল্পতম পরিমাণের মধ্যে সীমিত রাখে। এক্ষেত্রে যে অনিবার্য কুফলটুকু আবশিষ্ট থাতে তা হচ্ছে আত্মশ্লাঘা ও আত্মমর্যাদাবোধ আহত হওয়া। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একজন মুসলিম স্ত্রীর আচরণ ইসলামের নীতিমালার অধীনে মার্জিত ও পরিশীলিত থাকে এবং এ পরিস্থিতিতেও সে স্বামীর অনুগত ও তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে।

ইসলামীক প্রাথমিক যুগে প্রতিটি মুসলিম পরিবার প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহমমতা ও মহানুভবতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিল এবং তার চারপাশে সবাই ছিল আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার নমুনা। এ ব্যাপারে এক স্ত্রী বিশিষ্ট পরিবার, দুই স্ত্রী বিশিষ্ট পরিবার বা তদুর্ধ স্ত্রীবিশিষ্ট পরিবারে কোন পার্থক্য থাকতোনা। অবশ্য প্রথমোক্তটির সংখ্যাই ছিল বেশী। দ্বিতীয়টির সংখ্যা তার চেয়ে কম এবং তৃতীয়টির সংখ্যা সবচেয়ে কম।

বহু বিবাহের একটি সুফল দৃষ্টিগোচর হতো যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়। একথা সুবিদিত যে, ইসলামের শত্রুদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ রাসূল (সা) এর হিজরতের পর থেকেই শুরু হয় এবং তা খিলাফত, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রায় দুইশো বছর জুড়ে অব্যাহত ছিল এইসব যুদ্ধবিগ্রহ। এরপরও প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে, উত্তরে ও দক্ষিণে নতুন নতুন যুদ্ধ চলে। আর যুদ্ধে জনশক্তি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কতক শহীদ হয়, কতক আহত ও পংগু হয়, আবার কতক বন্দী ও নিখোঁজ হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীতে কখনো যোদ্ধার অভাব ঘটেনি। ইউরোপ, সিকি শতাব্দীতে দুটো যুদ্ধ করেই এত লোক ক্ষয়ের শিকার হয়েছিল যে, পুরুষের অভাব ও নারীর প্রাচুর্য তাদের জন্য বিরাট সামাজিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা দুইশো বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিল। তারপর পুনরায় তাতারদের সাথে যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং ক্রুশ যুদ্ধ চালিয়েছিল। অথচ তাদের কখনো নারীর আধিক্য ও পুরুষের অভাব দেখা দেয়নি।

আমার বিশ্বাস, এই সুফলের পেছনে ইসলামের দাসদাসী প্রথা ও বহু বিবাহ প্রথার বিরাট অবদান রয়েছে। কোন গবেষক যদি আমাকে এ দুটি ছাড়া আর কোন উপাদান দেখাতে পারেন, তবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

www.amarboi.org

আজকের যুগের মুসলমান ও বহুবিবাহ

যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্তাল প্রচারণা মুসলমানদের কর্ণকুহরকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলল, তাদের সরকারগুলো ও সশস্ত্র বাহিনীগুলো তাদের ওপর আপন পরাক্রম বিস্তার করে ফেললো, তাদের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন তাদের চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধিকে দিশেহারা করে দিতে লাগলো এবং তাদের প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতেরা ও মিশনারী ধর্ম প্রচারকরা যখন মুসলমানদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের ওপর পর্যন্ত আগ্রাসন চালাতে লাগলো, তখন মুসলমানরা জেগে উঠলো এবং তাদের চিন্তাবিদগণ মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোযোগী হয়ে উঠলো।

যে জিনিসটি নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাকবিতণ্ডা হয়েছিল, তা হচ্ছে একাধিক বিয়ে বা বহুবিবাহ প্রথা। সে সময়ে মুসলমানদের সমাজে এটির প্রচলন ছিল মোটামুটি ব্যাপক। কিন্তু পরে তা অপেক্ষাকৃত কমে যেতে থাকে। কোন কোন মুসলিম দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী, আবার কোথাও অপেক্ষাকৃত কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মিশরে এর প্রচলন সিরিয়া অপেক্ষা বেশী। আবার তুরস্কে সিরীয়ার চেয়েও কম ইত্যাদি ইত্যাদি।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তৎকালে বহুবিবাহ প্রথার মূলে মুসলমানদের অজ্ঞতাই ছিল প্রধান কারণ। খোদ ইসলামের বিধিসমূহ সম্পর্কেও তারা এতটা অজ্ঞ ছিল যে, তারা যে রকম কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে একাধিক বিয়ে করতো, তা মুসলমানদের সমাজ ও পরিবারের বিপুল ক্ষতি সাধন করতো, এমনকি তাদের নৈতিক চরিত্রেরও ক্ষতি সাধন করতো। ইসলামের অনুমোদিত বহুবিবাহ বিধির সাথে সে আমলের প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার কোন সম্পর্কই ছিলনা।

একদিকে খোদ মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা ও নৈতিক ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতি, অপরদিকে পাশ্চাত্যবাসীকর্তৃক বহুবিবাহ প্রথার কঠোর নিন্দা-সমালোচনা কিছু সংখ্যক মুসলিম সংস্কারককে বহুবিবাহের ক্ষতির প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে অনুপ্রাণিত করলো। যিনি এ ব্যাপারে সবচেয়ে জোরদার ও সবচেয়ে সুদূর প্রসারী অবদান রাখেন, তিনি ছিলেন ইমাম শেখ মুহাম্মদ আবদুহু রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

নিজের চাক্ষুস অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বহুবিবাহের বেশ কিছু ক্ষতির উল্লেখ করেছেন। স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ

"সূরা আন নিসার যে দুটি আয়াত আমি উদ্ধৃত করেছি, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, ইসলামে একাধিক বিয়ের সুযোগ অত্যন্ত সংকীর্ণ। একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করার ক্ষমতা থাকা ও কোন প্রকারের অবিচার করা হবেনা এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেই কেবল একটি অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে এর অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। এই বিধিগত কড়াকড়ির পাশাপাশি কেউ যখন এ যুগে বহুবিবাহ করার যে

www.amarboi.org

বাস্তব কুফল দেখা দিচ্ছে তার দিকেও দৃষ্টি দেয়, তখন এ ব্যাপারে তার কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, বহুবিবাহ প্রথা যে জাতিতে প্রচলিত আছে, সে জাতির উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই। এটা নিত্যদিনের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা যে, পরিবারে এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে পরিবারে শান্তি নেই, শৃংখলা নেই, উপরন্তু সেখানে পুরুষ যেন তার স্ত্রীদেরকে গোটা পরিবার ধ্বংস করার ব্যাপারে সহায়তা করছে। যেন প্রত্যেকে একে অপরের শত্রু। এরপর সন্তানরাও পরস্পরের শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়। এভাবে একাধিক বিয়ের কুফল ব্যক্তি থেকে পরিবারে এবং পরিবার থেকে জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে।"

"ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহুবিবাহের বেশ কিছু উপকারিতা ছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত হওয়া। আজকের যুগে বহুবিবাহের যে সব ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয়, তৎকালে এ সব ক্ষয়ক্ষতি পরিদৃষ্ট হতোনা। কেননা পুরুষ ও স্ত্রী সকলের অন্তরে ইসলাম ছিল গভীরভাবে বদ্ধমূল। সতিনের সাথে সতিনের যে রেশারেশি থাকতো তা তার সন্তান, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সংক্রমিত হতোনা। আজকের যুগে এক সতীন অপর সতীনের বিরুদ্ধে ও তার সন্তানদের বিরুদ্ধে নিজের সন্তান ও স্বামীকে পর্যন্ত হিংসার আগুনে উদ্দীপিত করে। আর স্বামী চরম নির্বুদ্ধিতার সাথে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর বশীভূত হয়ে যায় এবং সে যেভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় সেইভাবে ঘোরে। ফলে গোটা পরিবার বিপর্যয়ের শিকার হয়।"

"স্বামী ও সন্তানের গুরুত্ব যে স্ত্রী উপলব্ধি করেনা, তার কথা আর কী বলবো? সে তো নিজেকেও চিনেনা এবং নিজের ধর্ম সম্পর্কেও অজ্ঞ। ধর্মের নামে এমন কিছু কুসংস্কার ও গোমরাহী সে জানে যা আল্লাহর কোন কিতাবে কখনো নাযিল হয়নি এবং আল্লাহর কোন রাসূল তা কখনো বলেননি। মহিলাদেরকে যদি ইসলামের যথার্থ শিক্ষা দেয়া হতো, তার ফলে তাদের মনে ইসলামই সবচেয়ে প্রভাবশালী জিনিস হিসাবে বিরাজ করতো, আর সেই ইসলামী শিক্ষা তার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারের কালিমা থেকে মুক্ত রাখতো, তাহলে একাধিক বিয়ে গোটা জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতোনা। কিছু ক্ষতি হলেও তা স্ত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে করে একাধিক বিয়ের প্রচলন থাকা অবস্থায় জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রশিক্ষণ দেয়ার কোন উপায় নেই। তাই আলেমদের বিশেষত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর অধিকতর প্রভাবশালী হানাফী মযহাবের আলেমদের এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা কর্তব্য। তারা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে, ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্যই নাযিল হয়েছে এবং এর একটা অন্যতম মূলনীতি হলো নিজের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্যের ক্ষতি করা— উভয়টি থেকে মানুষকে নিরাপদ করা। কোন যুগে কোন জিনিসের দ্বারা যদি জাতি এমন ক্ষতির শিকার হয়, যে ক্ষতি ইতিপূর্বে হতোনা, তাহলে বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিধির পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে ইসলামের এই

www.amarboi.org

মূলনীতি বহাল থাকে যে, "উপকারিতা নিশ্চিত করার চেয়ে অনিষ্ট দূর করা অগ্রগণ্য।"

"এই আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অবিচার হওয়ার আশংকা থাকলে একাধিক বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।"

"আগেই বলেছি যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি এমন কঠোর শর্তাধীন যে, সেই সব শর্ত পালন করা খুবই কঠিন হতে পারে। তাই একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ বলেই ধরে নেয়া যায়। আমি বলেছি যে, সুবিচার না হওয়ার আশংকা থাকলে একাধিক বিয়ে অবৈধ হবে। তবে এ দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাইনা যে, এরূপ পরিস্থিতিতে যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে, তা বাতিল হবে। কেননা কোথাও যুলুমের আশংকা থাকা সত্ত্বেও যুলুম নাও হতে পারে। কেউবা যুলুম করে পুনরায় তওবা করে সুবিচার করা শুরু করতেও পারে। ফলে সে বৈধ জীবন যাপন করবে।"

ইমাম আবদুহুর উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, প্রথমত ঃ একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা ইসলামে যেরূপ রয়েছে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যেভাবে তা বাস্তবায়িত করেছে, তাতে একাধিক বিষয়কে ইমাম আবদুহু সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর মনে করেন না। দ্বিতীয়ত ঃ তিনি তাঁর যুগে একাধিক বিয়ের যে সব কুফল স্বচোখে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি মনে করেন যে, এ দ্বারা শুধু পরিবার নয় বরং সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তৃতীয়ত ঃ তিনি এমন আইন প্রণয়ন আবশ্যক মনে করতেন, যা দ্বারা একাধিক বিয়ের কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়।

এই আইনের সম্ভাব্য রূপরেখা সম্পর্কে তিনি কোন আভাস দেননি। তিনি একাধিক বিয়েকেই নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন, না শুধু এর ক্ষতি রোধ করা এবং এর ব্যাপকতা রোধ করার জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে আমরা কখনো মনে করিনা যে, তিনি বহুবিবাহ বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন— যদিও তার বক্তব্য থেকে এরূপ ধারণা করলেও করা যেতে পারে। কেননা বহুবিবাহ রোধ করার চেষ্টা একে তো আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনের নামান্তর। তাছাড়া এটা বহু বিবাহের অনুমতি যে সব প্রয়োজনের খাতিরে দেয়া হয়েছে, তা থেকে উপকৃত হতে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে বাধা দেয়ারও শামিল। ইমাম আবদুহু (রা) এরূপ ধারণা পোষণ করতেন বলে আমরা বিশ্বাস করিনা। আর যদিও করতেন, তবুও তা প্রত্যাখ্যাত হতো। কেননা আল্লাহর হুকুম ও আইন অন্য কারো অভিমত অপেক্ষা বেশী আনুগত্যের দাবীদার। আল্লাহ তার আইনের কল্যাণকারিতা আমাদের চেয়ে ভালো বুঝেন। কোন আইনের অপব্যবহার দ্বারা তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝায়না, বরং ঐ অপব্যবহার রোধ করার প্রয়োজন বুঝায়।

বহুবিবাহ বিলোপ বা সীমিত করার চেষ্টা

পরবর্তীকালে বেশ কিছু সংখ্যক আইনবিশেষজ্ঞ ও শরীয়তবিশেষজ্ঞ বহুবিবাহ বিরোধী এ সব বক্তব্যে প্রভাবিত হন। আর এগুলোকে সুকৌশলে কাজে লাগায় ইসলামবিরোধী

www.amarboi.org

মহল, যাতে মুসলিম দেশের সরকারগুলোকে হয় বহুবিবাহ বিলোপ, অথবা এমন কড়াকড়ি আরোপ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় যা বিলোপেরই সমার্থক হয়।

শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর ইন্তিকালের প্রায় বিশ বছর পর মিসরে এই মর্মে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, আদালত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ও ভরণপোষণের ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ- এই দুটি শর্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হওয়া সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেবে। ১৯২৬ সালে এই প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু অনেক তর্কবিতর্কের পর শাসকগণ এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নে আর উৎসাহী হয়নি। ফলে ১৯২৯ সালে যে অর্ডিন্যান্স জারী হয়, তাতে এ সম্পর্কে কোন ধারা ছিলনা। এরপর ১৯৪৩ সালে একবার এবং ১৯৬১ সালে আর একবার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু প্রবল বিতর্ক ও গণবিস্ফোরণের আশংকায় তা পরিত্যক্ত হয়।

তুরস্কে বহুবিবাহ বিলোপকারী আইন থাকা সত্ত্বেও কার্যত বহুবিবাহ বিলুপ্ত হয়নি। তবে তিউনিসে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে আইন জারী হয়েছে এবং তা কঠোরভাবে কার্যকরীও হয়েছে। অনুরূপভাবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানে বহুবিবাহের ওপর নানারকম শর্ত আরোপ করে তাকে কঠিন ও জটিল করা হয়। তবে তা ইসলামী মহলের বিরোধিতা ও গণরোষের কারণে তেমন সফলতার মুখ দেখেনি।

সিরিয়ায় ১৯৫৩ সালে একাধিক বিয়েকে শুধুমাত্র ভরণপোষণের ক্ষমতার শর্তযুক্ত করে আইন পাশ হয়। কিন্তু বিয়ে অশুদ্ধ বা বাতিল হবে বলে কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি।

যাহোক, বহুবিবাহকে সীমিত বা বিলোপ করার চেষ্টা মুসলিম বিশ্বে এখন আর তেমন চোখে পড়েনা। মুসলিম বিশ্বে এটা এখন আর কোন সামাজিক সমস্যার আকারে বিরাজ করছেনা। আরব ও ইসলামিক দেশগুলোর বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, একাধিক বিয়ের হার এখন এত কমে গেছে যে, হাজারে একটার বেশী নেই। এর কারণ সামাজিক জীবনের অগ্রগতি, জীবন যাপনের মান বৃদ্ধি এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্যের তদারকীর ব্যয় বৃদ্ধি। তা ছাড়া স্বামীদের কর্মব্যস্ততা এত বেড়ে গেছে যে, তারা এক স্ত্রী ও তার সন্তানদের দায়িত্বই ঠিকমত পালন করতে পারেনা। ফলে আরো বিয়ে করে দায়দায়িত্ব ও সমস্যা বাড়াতে কেউ আর উৎসাহ বোধ করেনা। আরো একটা কারণ এইযে, একাধিক বিয়ে প্রথমত গ্রামাঞ্চলে ধনী পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকতো। পরিবার প্রধান আশা করতো যে, অধিক সন্তান হলে তারা তার জমিজমা চাষ করে তার বোঝা লাঘব করবে। আর সন্তানরাও উচ্চতর শিক্ষা ও চাকুরী-বাকুরীর আশায় শহরে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে পিতার কাছে থেকে যাওয়াই পছন্দ করতো। কিন্তু এখন মানুষ শহরমুখী ও উচ্চ শিক্ষার অভিলাষী। তাই গ্রামের জমিতে যথই ফসল, গবাদি পশু, ইত্যাদির প্রাচুর্য থাকুক, মেধাবী উচ্চাভিলাষী সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, চাকুরী করা ও শহরে বাস করার জন্য অধিকতর আগ্রহী হয়ে গ্রাম ত্যাগ করছে। কোন কোন দেশে কৃষি

www.amarboi.org

সংস্কারের ফলে গ্রাম্য ভূমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে মানুষ শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সমস্ত কারণে একাধিক বিয়ের হার আপনা আপনিই হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তৃতির কারণে এই হার ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকবে। তাই বহুবিবাহ আমাদের কাছে এমন কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি, যার জন্য অস্থির হওয়া ও হৈ চৈ করার কোন আবশ্যকতা আছে। তিউনিস ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য দেশ যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছে তাকে নিছক পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদীদেরকে খুশী করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। সেই সাথে এ সব পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য, সম্মান ও ভাবমূর্তিকে হেয় করা এবং এর বিনিময়ে তাদের সহানুভূতি ও প্রশংসা কুড়ানোর হীন মানসিকতাও প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলিম বিশ্বে বহু বিবাহের হার বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা, তার বর্তমান হারও বহাল থাকবে বলে আমি মনে করিনা। আমি বরঞ্চ আশা করছি যে, আমাদের যুবকদের মধ্যে যেভাবে বিয়ের মানসিকতা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিবাহিতরা যেভাবে সন্তানসংখ্যা সীমিত করার চিন্তাভাবনা করছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য জাতির মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যাই হয়তো এত কমে যাবে যে, ইসরাইলের ন্যায় আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী অমুসলিম শক্তিগুলোর সামনে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।

যে কোন আইনসংগত পন্থায় বিয়ে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করার পরিবর্তে আমরা পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত মতবাদগুলো প্রচার করে নিজেদের জনসংখ্যা কমানোর চেষ্টা করে চলেছি। পাশ্চাত্যবাসীর এই ভ্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা, একাধিক বিয়ের কুফল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্রের ব্যাপকতার আশংকা।

পাশ্চাত্যবাসী তাদের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের কথা ভেবে এ কথাগুলো বলে থাকে। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ঠিকই বলে। কিন্তু আমরা আরবরা ও মুসলমানরা পৃথিবীর একটি বিশাল এলাকা জুড়ে বাস করি। এই বিশাল ভূখণ্ডের বিপুল সম্পদের খুব সামান্য অংশই আমরা এ যাবত ব্যবহার করতে পেরেছি। এ সব সম্পদকে, যদি বিজ্ঞানসম্মত ও কারিগরি পন্থায় বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার কয়েকগুণ বেশীকে এ দ্বারা লালন করা সম্ভব হতো। সুতরাং জনসংখ্যার আধিক্য হেতু ক্ষুধা ও দারিদ্রের আশংকার বিষয়টি আমাদের জন্য তেমন গুরুতর নয়। এটা ইহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের প্রচারণা মাত্র। আমাদের দেশগুলোর যাবতীয় মূল্যবান সম্পদকে কাজে না লাগানো পর্যন্ত এ সব আশংকায় কর্ণপাত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

আমাদের দেশগুলোর কিরূপ সম্ভাবনা রয়েছে, তা বিশ্বব্যাংকের সভাপতির একটি মন্তব্য থেকেই অনেকটা আঁচ করা যায়। তিনি একবার বলেছিলেন যে, বর্তমানে ৭০ লক্ষ লোক

www.amarboi.org

অধ্যুষিত ইরাকের যে সহায় সম্পদ রয়েছে, তা দ্বারা ঐ দেশে ৭ কোটি মানুষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানে লালন করা সম্ভব।

সুতরাং মুসলিম জাতিকে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার দিক দিয়ে, সামরিক দিক দিয়ে, জাতীয় দিক দিয়ে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পংগু করে দিতে পারে, এমন আইন প্রণয়নে তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে মুসলমানরা নয় বরং তাদের শত্রুরাই লাভবান হবে।

মুসলমানদের এই শত্রুদের রয়েছে নানা রকমের গোপন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যার সঠিক তথ্য মুসলিম সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও জানা নেই। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে হবে ও সাবধান হতে হবে। আমাদের জন্য রয়েছে পদে পদে ষড়যন্ত্র। শত্রুরা রয়েছে হুশিয়ার। তাদের ধাপ্পাবাজি ও ফন্দিফিকির অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা খুব কম লোকেরই জানা আছে।

শরীয়তের আলোকে একাধিক বিয়েকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দুইটি মাত্র শর্ত আরোপ করার অবকাশ রয়েছে। প্রথমটি হলো স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার তথা ন্যায়সংগত সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করা। আমরা দেখেছি যে, কুরআনে এটি একাধিক বিয়ের অনুমোদনের জন্য সুস্পষ্ট শর্ত, তবে বিয়ের বৈধতার শর্ত নয়। এ ব্যাপারে আলেমদের পূর্ণ ঐক্যমত্য রয়েছে। ইমাম আবদুহুর অভিমত ও অনুরূপ বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটিকে যদি বিয়ের বৈধতার জন্য আইনানুগ শর্তে পরিণত করা হতো, এবং এর ভিত্তিতে আদালতের বিচারককে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হতো, তাহলে বিচারকের পক্ষে সেই শর্ত কার্যকরী করা কিভাবে সম্ভব হতো? স্বামী ন্যায়বিচার করবে কিনা, সেটা কি পূর্বাহ্নে জানবার কোন উপায় আছে? কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা স্বামীর শপথ কি একথা বুঝবার জন্য যথেষ্ট যে সে ন্যায়বিচার করবে!

আমি অধ্যাপক আবু যুহরার এ মত সমর্থন করি যে, ন্যায়বিচারকে নৈতিক ও ধর্মীয় শর্ত অবশ্যই করা হয়েছে, কিন্তু আইনগত শর্ত করা হয়নি, যার ওপর একাধিক বিয়ে করা বা না করার অনুমতি নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো, প্রথমা স্ত্রীসহ দ্বিতীয় স্ত্রীর ও উভয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা থাকা চাই। আর এই শর্তটা যে পরোক্ষভাবে সূরা আন্ নিসার ৩নং আয়াতের শেষাংশেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা আগেই বলে এসেছি।

ঐ আয়াত থেকে ন্যায়বিচারের শর্তটাও জানা যায়। কেননা যে ব্যক্তি তার দুই স্ত্রী ও তাদের গর্ভজাত সন্তানদের ভরণপোষণের মত সচ্ছল নয়, সে দুই স্ত্রীর কোন একজনকেই খোরপোষ দিতে পারে, দু'জনকেই দিতে পারেনা। কাজেই নৈতিকভাবে ও ধর্মীয়ভাবে যে ন্যায়বিচারের শর্ত আরোপিত রয়েছে, তা পূরণ না হওয়াই অবধারিত হয়ে যায়। তার পক্ষে তার কতক সন্তানের ভরণপোষণের দায় এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। আর এই দায় এড়ানোর কারণেই তার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

ভরণপোষণের এ শর্তটা পূরণ করা অসাধ্য কিছু নয়। আদালত তার কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং তার আয় রোজগারের তথ্য জেনে নিশ্চিত হতে পারে যে, তার একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আর্থিক সচ্ছলতা আছে কিনা। আদালত যখন তাকে একাধিক স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের লালন পালনে সক্ষম বলে জানতে পারবে, তখন তাকে বিয়ে করতে বাধা দেয়ার আর কোন কারণ থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি অধ্যাপক আবু যুহরার অভিমতের বিরোধী। তিনি বলেছেন যে, আর্থিক সচ্ছলতার শর্তটাও ন্যায়বিচারের শর্তের মতই অনিশ্চিত। আসলে এ দুটো শর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেননা ন্যায়বিচার একটা মানসিক ও অদৃশ্য জিনিস। ওটা কার মধ্যে আছে ও কার মধ্যে নেই, সেটা শুধু আচার ব্যবহার ও লেনদেনের সময়ই বুঝা যায়। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা ও সামর্থ একটা বাস্তব ব্যাপার। খোঁজখবর নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই জানা যায় তার অস্তিত্ব। এর সুস্পষ্ট আলামত রয়েছে, যা দ্বারা সহজেই তার সন্ধান পাওয়া যায়।

অধ্যাপক আবু যুহরা বলেছেন যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সময় আর্থিক সামর্থ ও সচ্ছলতার বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর কোন ঘটনা রাসূল (সা) ও সাহাবীদের জীবেন ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। এর জবাব এই যে, সেকালে অর্থনৈতিক জীবন ছিল সহজ সরল এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভরনপোষণের ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বের আওতাভুক্ত ছিল। কাজেই কোন পরিবারের আর্থিক অচলাবস্থা দেখা দেয়ার আশংকা ছিলনা।

অবশ্য এই শর্তটিতে ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক বিয়ের অপপ্রয়োগ রোধ করার ব্যবস্থা যে রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিছক কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদগ্র বাসনা, স্ত্রী সম্ভোগে বৈচিত্র আনয়ন এবং প্রথমা স্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে কেউ কেউ দুই সংসারের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একাধিক বিয়ে করে বসে। এর ফলে উভয় স্ত্রী ও তাদের সন্তানেরা এবং গোটা পরিবার রসাতলে যেতে বাধ্য হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতির মূলে রয়েছে নিরেট নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতা। রাষ্ট্রের পক্ষে এহেন অমানুষিক পরিস্থিতি নীরবদর্শক সেজে দেখার পরিবর্তে হস্তক্ষেপ করা ও রোধ করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে কোন নির্বোধ লোকের আচরণে যেমন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং তাকে ও অন্যদেরকে ক্ষতি ও কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তার কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, এখানেও তেমনি হস্তক্ষেপ করা উচিত।

উপরোক্ত পর্যালোচনার পর আমি মনে করি যে, একাধিক বিয়েকে সর্বতোভাবে রহিত করাটাও সঠিক কর্মপন্থা নয়। কেননা এতে আল্লাহর আইনের ওপর আগ্রাসন চালানো হয় এবং মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক স্বার্থ ও ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা হয়। অনুরূপভাবে, একাধিক বিয়েকে একেবারেই বিনা শর্তে অবাধে অনুমতি দেয়াও ঠিক নয়। কেননা তাতে অপরিণামদর্শী লোকেরা এই অধিকারটির অপপ্রয়োগ করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে,

www.amarboi.org

যার ফলে স্ত্রীদের ও সন্তানদের জীবন নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেবে। সঠিক কর্মপন্থা ও সর্বাধিক ন্যায়সংগত কর্মপন্থা এ দুই চরম পন্থার মাঝখানে অবস্থিত।

এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু করণীয় আছে বলে আমি মনে করিনা। ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার প্রসার ঘটালেই একাধিক বিয়ের অধিকারটার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব। কেবল একাণ্ড প্রয়োজনেই, সমাজের কোন ক্ষতি সাধন না করেই এবং পারিবারিক ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন না করেই এ অধিকারের প্রয়োগ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একাধিক বিয়ে পছন্দ করিনা। আমার কোন এক পুস্তকে আমি লিখেছি যে, "যে ব্যক্তি দুই বিয়ে করে, সে জীবনের সমস্যার ও সংকটের মুকাবিলায় সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। আর যে ব্যক্তি তিন বিয়ে করে সে ধ্বংসের পথে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ধাবমান। আর যে ব্যক্তি চার বিয়ে করে সে উন্মাদ হবার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আল্লাহ আমাদের জন্য একাধিক বিয়ের যে ব্যবস্থা রেখেছেন, সেটা এজন্য নয় যে, আমরা বিনা প্রয়োজনেই নিজেদের জন্য কঠিন বিপদ মুসিবত সৃষ্টি করে নেব।"

বস্তুত আল্লাহর আইনে একাধিক বিয়ে বৈধ করার অর্থ হলো, আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কোন ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে করা অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিলে তার জন্য সে দরজা খোলা রাখা। এ কাজে সে উৎসাহিত করেনি, এর বিরুদ্ধে ঘৃণাও ছড়ায়নি। কেননা এ ব্যাপারে উৎসাহ বা ঘৃণা - কোনটারই প্রয়োজন অনুভব করেনা মানুষের সহজাত স্বভাব ও মেযাজ। মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতা এই যে, সে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটার বেশী স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় না। এক স্ত্রী নিয়েই সে সুখী ও স্থিতিশীল দাম্পত্য জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু আল্লাহর শাশ্বত ও চিরন্তন আইনের বৈশিষ্ট এই যে, এতে সর্বকালের সকল মানুষের জীবনের সকল অবস্থার চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

সুতরাং একাধিক বিয়েকে মোবাহ তথা বৈধ ও হালাল করে দেয়ার অর্থ এ নয় যে, এ কাজে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অথচ একে নিষিদ্ধ বা সংকুচিত করলে সেই সব সমস্যার সমাধানে অন্তরায় সৃষ্টি করা হতো, যার সমাধান কেবল একাধিক বিয়ে দ্বারাই সম্ভব। বস্তুত সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখাই একটা প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত আইনের বৈশিষ্ট, সমাধানের পথ রুদ্ধ করা নয়।

আজকাল পৃথিবীর কোন কোন জাতি তাদের যুদ্ধোত্তর জীবনের কঠিনতম সমস্যা জনশক্তির ঘাটতির মুকাবিলা করার জন্য আমাদের বহুবিবাহ ব্যবস্থার সাহায্য নেয়ার কথা ভাবছে। এমতাবস্থায় আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, ঐ সব জাতি যে সমস্যায় ভুগছে আমরাও কি তার সম্মুখীন নই? ইসরাইলের সাথে এমন একটা অনিবার্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বিপুল জনশক্তির গড়ে তোলা কি আমাদের উচিত নয়, যে যুদ্ধে হতে পারে

www.amarboi.org

বিপুল লোক ক্ষয়? শুধু কি ইসরাইল? আমাদের তো ইসরাইল ছাড়া অন্যান্য দেশের সাথেও যুদ্ধ করতে হতে পারে। আমাদের সেই সম্ভাব্য অনাগত যুদ্ধ আমাদের জাতির অতীতে লড়ে আসা যুদ্ধগুলোর চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে। এমনকি তাতারদের সাথে, ক্রুসেডারদের সাথে, রোমক ও পারসিকদের সাথে আমরা যে সব যুদ্ধ করেছি, তার চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে অনাগত কালের যুদ্ধ। আর আমার এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতের সেই সব সম্ভাব্য যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে আমাদের জাতি বহু বিবাহ ব্যবস্থা দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে। যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকার জন্য সে ক্রমাগত মুজাহিদ বাহিনীর সরবরাহ পেতে থাকবে। আর যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হবে যুদ্ধের পর তার ক্ষতিপূরণও হতে থাকবে এই ব্যবস্থার কল্যাণে। আমি এ কথা নিছক কল্পনার জাল বুনে বলছিনা। আমি এখন থেকেই এর লক্ষণসমূহ দেখতে পাচ্ছি। বাস্তবতার মুখোমুখি হবার ভয়ে চোখ বুজে থাকা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। "আমি ছাই এর স্তূপে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। এই স্ফুলিঙ্গ থেকে বৃহত্তর অগ্নুৎপাত আসন্ন।"

অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে লক্ষ লক্ষ ইহুদীর সমাবেশ ঘটাচ্ছে। ইসরাইলের নিজস্ব কৃষি সম্পদের সম্ভাবনা অত্যন্ত সংকীর্ণ। অথচ এই বিপুল জনসংখ্যার জীবন ধারণের উপকরণ কিভাবে সংগৃহীত হবে, সে হিসাব সে করছেনা। সে নিরন্তর কেবল তার লোক সংখ্যা বাড়ানোর কথাই ভাবছে এবং বিশ্ব জনসংখ্যা কমানোর সকল ধ্যান-ধারণাকে সে অগ্রাহ্য করে চলেছে। শুধু রাজনৈতিক ও আগ্রাসী উদ্দেশ্যে সে ক্রমাগতভাবে সারা পৃথিবী থেকে ইহুদীদেরকে এনে জড় করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের খোদ ইহুদী বিজ্ঞানীদেরই প্রচারিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতবাদ দ্বারা প্রতারিত হওয়া কিভাবে সংগত হতে পারে? বিশেষভাবে আমাদের আরবদের কথাই ধরুন। আমাদের দেশগুলো এত বিশালায়তন যে, বর্তমান জনসংখ্যার দশগুণ ধারণে সক্ষম। তদুপরি তার বিপুল খনিজ সম্পদ আহরিত হলে, জনশক্তি ও জ্ঞানগত শক্তিকে সমন্বিত করলে এবং শিল্পকারখানার বিকাশ ঘটালে তার জনসংখ্যা আতংকে ভুগবার কোনই কারণ নেই এবং একাধিক বিয়ে-বন্ধ করারও কোন যৌক্তিকতা নেই।

আরবদের মত সমস্যায় রয়েছে পাকিস্তানও। তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী জনসংখ্যা সম্বলিত ভারতের সাথে তার এমন মারাত্মক সমস্যা বিদ্যমান যে, যুদ্ধের আশংকা ছাড়া তার একটা দিনও কাটতে চায়না। এমতাবস্থায় তার লোকসংখ্যা বাড়ানো ও জনগণের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের পরিবর্তে লোকসংখ্যা কমানো ও একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করার যে চেষ্টা সেখানে চলছে, তাকে অপরাধ ছাড়া আর কী বলা যায়? অথচ সংকল্পের দৃঢ়তা ও বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কার্যকর জনশক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব কিছু নয়।

আমি এ প্রসংগে অধ্যাপক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের গ্রন্থ "আল কুরআনে নারী" থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করা সংগত মনে করছি। তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

www.amarboi.org

"শরীয়তের করণীয় শুধু এতটুকু যে, সে সীমারেখা চিহ্নিত করে দেবে এবং যে কাজ সেচ্ছায় করা হয় ও যে কাজ দায়ে ঠেকে করতে হয়, তার মধ্যবর্তী সর্বোত্তম কর্মপন্থা বাতলে দেবে। এছাড়া আর যত কাজ আছে, তা সাধারণ মোবাহ তথা বৈধ কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ সব কাজের কোনটা মানুষ সঠিকভাবে করে, কোনটার ভুল বা অপপ্রয়োগও করে এবং ভুল বোঝেও। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অবস্থায় যথা উন্নতি ও অধোপতনে, অজ্ঞতায় ও বিজ্ঞতায়, সততায় ও অসততায়, সমৃদ্ধিতে ও দুঃখকষ্টে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন রকম কর্মপন্থা অবলম্বন করে থাকে।"

বস্তুত ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুমোদিত মোবাহের সংখ্যা অনেক। তবে সে এ সব মোবাহ্ জিনিসের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহারে তাকে বাধ্য করেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহু খাদ্য জিনিস মোবাহ্। অথচ এই খাদ্যের অপব্যবহারের দরুন অথবা পরিমাপে কম বা বেশী খেয়ে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুস্থ মানুষের উপযুক্ত খাবার ও রোগীর উপযুক্ত খাবারে অথবা এক সময়ে যে খাদ্য উপযোগী ও অন্য সময়ে সে খাদ্র অনুপযোগী, তার মধ্যে বাছবিচার না করে নির্বিচার ও অবিবেচনা প্রসূত খাবার খেয়ে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে আল্লাহ্ বা রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। কেননা অবিবেচক লোকদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিলে তা তাদের জন্য অভিজ্ঞতা ও সেচ্ছায় গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখার চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর হতো।

একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলে সমাজের কাছে বিয়ের ভিত্তি ভেংগে দেয়া ও গোপনে বা প্রকাশ্যে বিয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকেনা। পক্ষান্তরে একাধিক বিয়ের অনুমতি অবারিত থাকলে সমাজ তার দোষ-ক্রুটি সংশোধনের বহু পন্থা অবলম্বন করতে পারে। নৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমস্যা দেখা দিলে কিংবা পরিবারে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হলে তার প্রতিকর সমাজের লোকেরাই করতে পারে।

মার্জিত শিক্ষা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সুখদায়ক ভালোবাসা ও পরিবার পরিচালনায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে যদি উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, তাহলে স্বামীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্পর্ক নিষ্ক্রীয় করতে হয়না, বরং তা আপনা আপনিই নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দুই স্ত্রীকে একত্রে রাখার মত পরিবেশ গৃহে সৃষ্টি হতে পারে না, যদি তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসার বন্ধন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম না হয়।

দারিদ্র বা সচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই পরিস্থিতি একাধিক বিয়ের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণে যতই সমর্থ হোক, সে

www.amarboi.org

এমন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সমাজে পাবেনা যে তার সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে রাযী হবে। কেননা তাকে একটা সতিনের সাথে প্রথম দিন থেকেই সংঘাতে লিপ্ত হতে হবে। তাছাড়া একাধিক ধনীর দুলালীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তাদের বিলাস ব্যসনের চাহিদা মেটানো স্বামীর পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

অবশ্য একজন দরিদ্র ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী ও বহু সংখ্যক সন্তান পেয়ে নিজের উপার্জনে বিশেষত কৃষি উৎপাদনে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। তবে দাম্পত্য জীবনে তাকেও ভরণপোষণ, আবাসিক স্থান সংকুলান ও সতিনের দ্বন্দ্বজনিত সংকটে পড়তে হতে পারে।

একাধিক বিয়ে যতই মোবাহ বা বৈধ কাজ হোক, সমাজ বা সরকার স্বামীর ওপর তার সন্তানদের লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষার আর্থিক সংগতির শর্ত আরোপ করতে পারে এবং নারী পুরুষের স্বাধীনতাও অধিকারকে সংরক্ষণের এমন নিশ্চয়তা দিতে পারে, যা নিয়ন্ত্রণহীন বিয়ের কারণে ক্ষুণ্ন হয়।

অপর দিকে প্রয়োজনের সময় একাধিক বিয়ের অনুমতি থাকা দ্বারা সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হতে পারে তখন, যখন কোন কারণে নারী ও পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এ কারণে সমাজে অভাব ও ক্ষুধা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে বহু বিবাহ প্রথা সমাজে অভাব ও ক্ষুধার ব্যাপকতা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।

পরিশেষে বলবো, আজকের পাশ্চাত্যে নারীর যে চরম অমর্যাদা, সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের যে ব্যাপকতা ও জারজ সন্তানদের যে ছড়াছড়ি, তা কখনো হতো না যদি তারা একাধিক বিয়েকে বৈধ বলে গ্রহণ করতো।

www.amarboi.org

তালাক প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ তালাকের বিধি চালু করেছেন স্বামীস্ত্রীর অবনিবনার শেষ প্রতিকার হিসাবে। সকল আপোষ প্রচেষ্টা যখন নিষ্ফল প্রমাণিত হবে, কেবল তখনই প্রয়োগ করার জন্য তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ শত শত বছর ধরে পশ্চিমারা এই তালাক ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইসলামকে দোষারোপ করে যাচ্ছে এবং এটিকে ইসলাম কর্তৃক নারীর অবমাননা ও বিয়ের পবিত্রতা বিনাশের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে চলেছে।

এ কথাও সত্য যে, ইসলাম তালাক ব্যবস্থা প্রথম প্রচলন করেনি বরং ইহুদী ধর্মীয় বিধানেও এর ব্যবস্থা ছিল এবং পৃথিবীতে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই এ ব্যবস্থা সুপরিচিত ছিল। ইসলাম সামাজিক সংস্কারের যত পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে যেমন সব সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার ও সম্মানের নিশ্চয়তা বিধান করেছে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও স্বামী স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও সম্মানকে নিরাপদ করেছে। পাশ্চাত্যবাসী তালাক বৈধ করতে গিয়ে যেমনটি করেছে, ইসলাম তেমনভাবে তালাককে বিয়ের পবিত্রতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এবং দাম্পত্য জীবনকে স্থিতিহীন করার হাতিয়ারে পরিণত করেনি।

ইসলাম প্রথমত বিয়ের চুক্তিকে আজীবন স্থায়ী চুক্তি হিসাবে গণ্য করেছে। এ জন্য বিয়ের কোন মেয়াদ নির্ধারণ করেনি এবং মেয়াদ নির্ধারণ করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এমনকি কেউ যদি মেয়াদ নির্ধারণ করেও তবে সেই মেয়াদ বাতিল ও বিয়ে আজীবন স্থায়ী হবে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে। শিয়া মযহাবের লোকেরা এটা বৈধ মনে করলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সুন্নী মুসলমানগণ এটিকে গ্রহণ করেনি। এমনকি শীয়াদের মধ্য থেকেও একটি উল্লেখযোগ্য দল যায়দী 'মুত'আ 'বিয়ে বা মেয়াদী বিয়েকে বাতিল গণ্য করে থাকে। কিন্তু ইসলাম বিয়ের চুক্তিকে আজীবন স্থায়ী বলে ঘোষণা করলেও সে মানুষের স্বভাব ও মেজাজ, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, চরিত্র ও স্বভাবের পার্থক্য হেতু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা, বিয়ের স্থায়িত্ব বা অবসানে উভয়ের স্বার্থের বৈপরিত্য কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের অন্য কোন বিরোধ দেখা দেয়ার বাস্তব সম্ভাবনার ব্যাপারে অন্ধ নয়। এ সব বাস্তবতা থেকে সে চোখ বুজে বা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনা। অনুরূপভাবে, সে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্বে আপোষ রফার সম্ভাবনা সম্পর্কেও উদাসীন নয়। তাই এ ক্ষেত্রে সে এমন নিপুণ আইন রচনা করে দেয়, যাকে তার শাব্দিক ও তাৎপর্যগত বৈশিষ্টসহকারে বাস্তবায়িত করলে এবং জনগণ তার বিধি ও শিক্ষার যথাযথ আনুগত্য করলে দাম্পত্য শান্তির ব্যাঘাত ঘটার আদৌ কোন অবকাশ থাকেনা।

তালাকের ক্ষেত্রে পালিত নীতিমালা

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য কলহ নিরসনে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেঃ

www.amarboi.org

১. স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে সে একে অপরের প্রতি ও সন্তানাদির প্রতি দায়িত্ব সচেতন হবার আহবান জানায় এবং এ ব্যাপারে সে যে স্বয়ং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য, তাও উপলব্ধি করতে বলে। কেননা তারা সদাচরণ করলে বা অসদাচরণ করলে উভয় অবস্থায় আল্লাহ তাদের ব্যাপারে অবহিত। উভয়কে তিনি পরিবার সম্পর্কে দায়িত্বশীল ও পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। সহীহ আল বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেনঃ "তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক যাদের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব তোমাদের অর্জন করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারীও তার স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

২. যখন উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন ইসলাম উভয়কে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়, বিশেষতঃ একজন অন্যজনের যা কিছু অপছন্দ করে তার প্রতি ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়। কেননা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, মেজাজমর্জী ও স্বভাব চরিত্র সমান বানানো হয়নি। তাই মানুষ যা পছন্দ করেনা, তা দেখেও না দেখার ভান করা ছাড়া উপায় থাকেনা। বিশেষতঃ অনেক সময় মানুষ যা অপছন্দ করে তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত থাকে। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। তাদেরকে যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে মনে রেখ, এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমরা অপছন্দ করে থাক, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা আন নিসা ১৯)

৩. কিন্তু এরপরও যখন দেখা যায় যে, একে অপরকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, পরস্পরের মতবিরোধ কেউ সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে পারছেনা এবং উভয়ের মতবিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন ইসলাম এই মতবিরোধ মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করে উভয়ের আত্মীয় স্বজনের ওপর। স্বামী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে এবং স্ত্রী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে এবং উভয়ে পারিবারিক আদালত বা শালিশী আদালত হিসাবে কাজ করবে। তারা মতবিরোধের কারণগুলো খতিয়ে দেখবে এবং তা মিটিয়ে ফেলে সমঝোতা ও আপোষ রফার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি মতবিরোধ নিরসন ও আগের মত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ফিরে আসুক এটা কামনা করে, তাহলে উভয় শালিশ তাদের কাজে অবশ্যই সফল হবে। এ কথাই আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছেঃ "তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ শত্রুতায় পরিণত হবার আশংকা কর, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ পাঠাও। তারা দু'জনে পরিস্থিতির সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন। (সূরা আন নিসা ২৫)

www.amarboi.org

৪. এই শালিশীও যদি ব্যর্থ হয় এবং উভয়ে নিজ নিজ মতের উপর জিদ ধরে, তাহলে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি মাত্র তালাক প্রয়োগের অনুমতি দেয়, তাও এই শর্তে যে, স্ত্রী স্বামী গৃহে থেকেই তিন মাসের কাছাকাছি মিয়াদী ইদ্দত পালন করবে, কেবল স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক দাম্পত্য আচরণ স্থগিত থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ফিকাহর কিতাবে পাওয়া যাবে। স্বামী গৃহে ইদ্দত পালনের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে আগের মত সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়া ছাড়া কিছু নয়। উভয়ের উত্তেজনা যখন প্রশমিত হবে এবং নিজেদের ও সন্তানদের জীবনে তাদের বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতি তারা দেখতে পাবে, তখন হয়তো উভয়ে জিদ ও হটকারিতা ত্যাগ এবং বিতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে দাম্পত্য জীবনের সাবেক সুখশান্তি ও ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনতে রাযী হয়ে যাবে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলাম একটা অনিবার্য ব্যবস্থা হিসাবে তালাকের অনুমতি দিলেও তালাককে যে সে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ও গর্হিত জিনিস মনে করে, সে কথা হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ "হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস হচ্ছে তালাক।"

তাছাড়া প্রাথমিকভাবে যে তালাকটি স্বামী দেয়, তা তালাকে রজয়ী বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং স্ত্রীর ইদ্দত যতদিন থাকে ততদিন তা প্রত্যাহারযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করতে কোন মোহর, স্বাক্ষী ও আক্‌দ তথা পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবেনা। তালাকের প্রভাব খতম করার জন্য যে কোন মুহূর্তে তারা দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করে নিলেই পারে। কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সাবেক দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে, স্ত্রীকে শুনিয়ে বলতে হবেঃ আমি তোমার তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। এতেই সে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবে।

৫. ইদ্দতকালে স্বামী তালাক প্রত্যাহার না করলে তালাক বায়েনে পরিণত হবে। অর্থাৎ এক্ষণে স্বামী নতুনভাবে দেন মোহর নির্দ্ধারণ করে নতুন আক্‌দ করে বিয়ে করা ছাড়া তার কাছে আসতে পারবেনা। এ সময়ে স্ত্রী যদি তার কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করতে চায় তবে প্রাক্তন স্বামী তাকে তার কাছে ফিরে আসার জন্য এবং দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ দিতে বা বাধ্য করতে পারেনা।

৬. স্বামী স্ত্রী যখন সাবেক দাম্পত্য জীবনে ফিরে যায়, তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হোক বা ইদ্দতের পরেই হোক, এবং এরপর পুনরায় তাদের মধ্যে অবনিবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে আমরা (যারা এই পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট) পুনরায় অবিকল পূর্বোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর পুনরাবৃত্তি করবো। অর্থাৎ উভয়কে পরস্পরের সাথে সদব্যবহার করার উপদেশ দেবো, একজনকে অপরজনের অপছন্দনীয় আচরণ সহ্য করতে বলবো, কিন্তু

www.amarboi.org

বিরোধ বেড়ে গেলে পারিবারিক শালিশীর সাহায্য নেবো, এবং এতেও নিষ্পত্তি না হলে স্বামী দ্বিতীয় তালাক দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম তালাকের বেলায় অনুসৃত যাবতীয় বিধি প্রযোজ্য হবে।

৭. দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি স্বামী স্ত্রী পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে যায় এবং আবার অবনিবনা দেখা দেয়, তবে আবারো তালাকের পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে। এ সব পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তৃতীয় ও চূড়ান্ত তালাক দেয়া বৈধ হবে। এবারের তালাকে উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এরপর উভয়ের পুনর্বিবাহ কেবল তখনই সম্ভব, যখন স্ত্রীর ইদ্দতের পর অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিরোধ বাধবে ও তালাক সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাওয়া ও ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়া বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে হতে হবে এবং এর কোন পর্যায়েই কোন কূটকৌশল বা চাপ প্রয়োগ করা চলবেনা।

এই ব্যবস্থার যুক্তি এই যে, বারবার শালিশী প্রচেষ্টা, এবং পরপর দুইবার তালাক ও স্ত্রী কর্তৃক তালাকের ইদ্দত পালনের পর স্বামী একেবারেই গুরুতর ও অসহনীয় কোন্দল সংঘটিত হওয়া ছাড়া তৃতীয় তালাক দিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা নয়। এমনটি ঘটতে পারে কেবল তখনই, যখন স্বামীর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, ক্রমাগত দুবার তালাক ও পুনর্মিলন সংঘটিত হবার পরও যখন অশান্তি অব্যাহত রয়েছে, তখন দাম্পত্য জীবনের নামে এমন নরকে আর বাস করা সম্ভব নয়। তাই সে এই দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে নিষ্কৃতি লাভের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। এই পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাকে যে কথা বুঝাতে চান তা এই যে, সে যদি তৃতীয় তালাক প্রয়োগ করে, তাহলে স্ত্রী তার কাছ থেকে চূড়ান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সে অন্য স্বামীর ঘর করার পর ছাড়া তার কাছে আর ফিরে আসাতে পারবেনা। ইসলাম যদি এর পরও তাদেরকে ক্রমাগত বিয়ে করার ও ছাড়াছাড়ি হওয়ার অনুমতি দিত, তাহলে তা হতো দাম্পত্য জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নামান্তর এবং পারিবারিক দুঃখ ও বিপর্যয়ের এমন এক ধারাবাহিকতা, যার কোন শেষ নেই। তাই যুক্তির দাবী এই যে, তালাকের ধারাবাহিকতার একটা শেষ সীমা থাকা চাই। আল্লাহ এই সীমা নির্দ্ধারণ করেছেন তৃতীয় তালাক পর্যন্ত, যাতে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের দুর্দশা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়া এবং তারপর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসা স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্যই একটা কঠিন মানসিক আঘাত স্বরূপ। প্রত্যেক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ স্বাভাবিকভাবেহ এমন একটা পরিণতির দিকে নিজের দাম্পত্য জীবনকে ঠেলে দিতে চাইবেনা। তাই তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রী অন্য স্বামীর ঘর না করে ফিরে আসতে পারবেনা এমন বিধান প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় তালাকের ওপর একটা

www.amarboi.org

দুরতিক্রম্য বাধা আরোপের নামান্তর। এই বাধা অতিক্রম করে তৃতীয় তালাক দিলে তার ফলে যে কেমন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তা স্বামীর জানা আছে। তাই সে তৃতীয় তালাক দিতে কেবল তখনই রাযী হবে, যখন সে স্ত্রীর সাথে জীবন যাপনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে যাবে।

এই হচ্ছে ইসলামে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও ব্যবস্থা।স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ইসলাম সর্বতোভাবে কামনা করে যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথম প্রথম বিরোধের সূত্রপাত ঘটা মাত্রই যেন দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন না হয়। ইসলাম এ জন্য আপোষ মীমাংসার একাধিক সুযোগ রেখেছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা নিজেদের মনোভাব পাল্টাতে পারে যদি তারা সম্পর্ক বহাল রাখতে ও দাম্পত্য জীবনকে স্থিতিশীল ও সুখী রাখতে ইচ্ছুক হয়।

তালাকের ক্ষমতা এককভাবে স্বামীর হাতে রাখার কারণ

তালাক সম্পর্কে যে প্রশ্নটি সচরাচর করা হয়, তা প্রধানত এমন লোকদের সৃষ্টি, যারা ইসলামের প্রতি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল নয়। সেই প্রশ্নটি হলোঃ শুধু পুরুষের কর্তৃত্বে তালাকের ক্ষমতা সমর্পিত হলো কেন এবং যখন ইচ্ছা, বিয়ে ভেংগে দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হলো কেন? যে স্ত্রী এখনো তার জীবন সংগিনী হিসাবে বহাল আছে, তার মতামত দেওয়ার সুযোগ রাখা হলোনা কেন? বিশেষত প্রচণ্ড ক্রোধ বা ঝগড়ার পরেও যখন এমন ঘটনা ঘটে থাকে।

এ ব্যাপারে পাঁচটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল—

১. তালাকের ক্ষমতা শুধু স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা।
২. উভয়ের ঐকমত্যের ওপর ছেড়ে দেয়া
৩. আদালতের মাধ্যমে তালাক প্রয়োগের ব্যবস্থা
৪. এককভাবে পুরুষের হাতে অর্পণ করা
৫. পুরুষের হাতে অর্পণ করা, তবে তার পাশাপাশি স্বামী ক্ষমতার অপব্যবহার করলে স্ত্রীকেও তালাক প্রয়োগের সুযোগ দেয়া।

এক্ষণে এই ব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে দেখা যাক।

১. এককভাবে স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা দেয়ার কোনই যৌক্তিকতা নেই। কেননা এতে স্বামীর আর্থিক ক্ষতি ও পরিবারের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে। স্ত্রী তালাক দ্বারা আর্থিকভাবে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। সে নতুন করে দেনমোহর পায়, নতুন ঘর পায় ও নতুন স্বামী পায়। ক্ষয়ক্ষতি যা হবার , তা কেবল স্বামীরই হয়। স্ত্রীকে তার মোহরানা দিতে হয়, গৃহ ও সন্তানের খরচ বহন করতে হয়। ইতিপূর্বে তো সে স্ত্রীর সমস্ত খোরপোশ দিয়েছে ও বাড়ীর আসবাবপত্রের মূল্য পরিশোধ করেছে। কাজেই স্ত্রীকে এককভাবে তালাক দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হলে স্বামীর সাথে দু কথা হলেই অমনি তালাক দেয়া ও তার উপর আর্থিক বোঝা আরোপ করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যেত। বিশেষত

www.amarboi.org

ত্বরিত উত্তেজিত ও অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়া তাদের স্বভাব এবং উত্তেজনার সময়ে পরিণাম চিন্তা তাদের প্রায়ই থাকে না। আমরা একটি অবস্থা কল্পনা করলেই এর অসারতা বুঝতে পারি। ধরুন, স্বামী তার স্ত্রীর মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করলো, আর তৎক্ষণাৎ স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে দিল। এই তালাক প্রাপ্তির পর সে তার স্বামীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। অথচ স্বামীই ঐ বাড়ির মালিক এবং সে ঐ বাড়ীর যাবতীয় খরচ বহন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াতে পারে, ভাবুন তো।

২. স্বামী স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যের ওপর ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেয়াও অযৌক্তিক। উভয়ের এ ব্যাপারে একমত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। স্বামী স্ত্রী উভয়ে তালাকের পক্ষে সমঝোতায় উপনীত হলে ইসলাম তাতে আপত্তি করেনা। কিন্তু এই সমঝোতার ওপর এর বৈধতাকে ঝুলন্ত রাখতে পারেনা।

ধরুন, পুরুষর পক্ষে তার স্ত্রীর সাথে জীবন যাপন করা যার পরনাই কষ্টকর হয়ে পড়লো। তাই সে তাকে তালাকের ওপর একমত হতে অনুরোধ করলো। কিন্তু স্ত্রী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। এমতাবস্থায় কি করা যাবে? অধিকাংশ স্ত্রীরা এরূপ পরিস্থিতিতে এক ধরনের বেপরোয়া মনোভাব অবলম্বন করে এবং এরূপ ভাব দেখায় যে, "মিনসের কষ্ট হচ্ছে তাতে আমার কী? যা পারে তা করুকগে।" তা ছাড়া স্ত্রী তাদের বাসগৃহের ওপর কোন অর্থ ব্যয় করেনি এবং পুরুষকে কোন টাকাকড়িও দেয়নি। এমতাবস্থায় পুরুষের ইচ্ছার কার্যকরিতা স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভশীল থাকবে কোন্ কারণে। আমরা কিভাবে তাকে এমন এক স্ত্রীর সাথে জীবন যাপন করতে বাধ্য করবো, যার সাথে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এবং সে তালাকেও সম্মতি দিচ্ছেনা?

৩. আদালতের মাধ্যমে তালাকের প্রথা পাশ্চাত্যে চালু থাকলেও তাতে তেমন কোন ফায়দাও হচ্ছেনা এবং তার ক্ষতির দিকগুলোও প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম দিক হচ্ছে আদালতের সামনে, এবং দুই পক্ষের উকীল ও সমর্থকদের সামনে দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয়গুলো ফাঁস হয়ে যাওয়া। এ সব গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ায় উভয় পক্ষের জন্য শুধু বিব্রতকর নয়, ঘোর অকল্যাণের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ধরা যাক, কোন স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, আর এ কারণে আদালতে তালাকের আবেদন জানায়। তাহলে এ ব্যাপারে কত লজ্জাকর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর এ সব ব্যাপার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়শীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে পত্রপত্রিকা তো তাদের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে।

আর এ দ্বারা কোন ফায়দার আশাও যে নেই, তা পাশ্চাত্য জগতেই ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আদালত এ সব ব্যাপারে নেহাত নামকা ওয়াস্তে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

www.amarboi.org

অনেকে তো আদালতের শরণাপন্ন হবার আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে তালাকের ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকে। ফলে আদালত তাদের আবেদন সরাসরি মঞ্জুর করে নেয়।

সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যাপার এইযে, কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে ব্যভিচার প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত তালাকের পক্ষে রায় দেয় না। কখনো কখনো স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরস্পরকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য ও দলীল প্রমাণ পেশ করে তালাক আদায় করা হয়।

এখন ভাবুন তো, কোন্টা অধিক সম্মানজনক? কেলেংকারীর আগেই তালাক হওয়া না কেলেংকারীর পরে?

৪. স্বামীর হাতে এককভাবে তালাকের ক্ষমতা অর্পণই স্বাভাবিক এবং স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি তার আর্থিক দায়দায়িত্বের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে যতক্ষণ দেনমোহর প্রদান এবং বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বে নিয়োজিত, ততক্ষণ দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটনোর অধিকার তারই থাকা উচিত-যদি সে এর ফলে যে আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক দায়দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসবে, তা বহনে রাযী থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরা তাদের আবেগের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে। ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে পরিণাম চিন্তা সাধারণত তাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। তালাকের কারণে কত আর্থিক ক্ষতি হবে এবং নতুন বিয়ে করা কত ব্যয় সাপেক্ষ, তা কোন স্বামীরই অজানা থাকেনা। তাই স্ত্রীর সাথে জীবন যাপনের সুখ শান্তির আশা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া এবং আর্থিক দায়দায়িত্বের হিসাব নিকাশ না করে কোন স্বামীই তালাক দিতে অগ্রসর হয়না। তাই আমি মনে করি যে, তালাকের অধিকার কেবল পুরুষের হাতে অর্পন করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং ইসলামের বহুল পরিচিত মূলনীতি "আল গুরমু বিল গুন্‌মি" (আয় যার দায় তার) এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

একটি অভিযোগ ও তার জবাব

কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, পুরুষ সব সময় কোন অসুবিধার কারণে বা বাধ্য হয়ে তালাক দেয়না, বরং কোন কোন সময় স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ও তার ক্ষতি করার জন্য তালাক দিয়ে থাকে। এমন কি কেউ কেউ তো মোটেই কোন নৈতিকতার ধার ধারেনা বরং কেবলমাত্র নতুন স্ত্রীর স্বাদ গ্রহণের জন্যও তালাক দিয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রীর রেখে যাওয়া সন্তানের সাথে নতুন স্ত্রী খারাপ ব্যবহার করে। এমনকি নয়া স্ত্রীকে খুশী করার জন্য স্বামী নিজেও তার আগের পক্ষের সন্তানদের ওপর যুলুম করে থাকে।

এর জবাব এইযে, পৃথিবীর সকল ব্যবস্থারই অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। যার হাতেই কোন ক্ষমতা থাকে সে যদি অসৎচরিত্র ও অধার্মিক হয় তবে সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবেই। কিছু লোক কোন ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ করে এই অজুহাতে কোন ভালো ব্যবস্থাকে বাতিল করা চলেনা। কেউ সীমা অতিক্রম করতে পারে এই ভয়ে দেশের কারো হাতেই কোন ক্ষমতা দেয়া হবেনা তাতো গ্রহণযোগ্য নয়।

www.amarboi.org

ইসলাম তার বিধিব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি পর্যায়ে তার প্রথম মূলনীতি নির্ধারণ করেছে মুসলমানের বিবেকের সচেতনতা, তার সততা ও খোদাভীতিকে। এ জন্য সে একাধিক পথ ও পন্থা নির্ণয় করেছে, যার প্রত্যেকটি সঠিকভাবে অনুসৃত হলে প্রত্যেক মুসলমানের বিবেক জাগ্রত থাকতে বাধ্য এবং প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার তার দ্বারা যে সংঘটিত হবে না, এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমাদের সমাজের ধর্মপ্রাণ পরিবারগুলোতে তালাক খুবই বিরল ঘটনা। অথচ যারা ধর্ম ও নৈতিকতার ধার ধারেনা, তারা ধনী বা গরীব যাই হোক, তাদের মধ্যেই তালাকের হিড়িক বেশী।

এ কথাও অস্বীকার করা যায়না যে, পৃথিবীর যে কোন সমাজে যে কোন আইন বাস্তবায়িত হবার সময় সমাজের কোন না কোন ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই কোন আইন বা ব্যবস্থা ভালো না মন্দ, তা নির্ণয়ের প্রধানতম মানদণ্ড হলো বেশীর ভাগ মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হয়, না ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সঠিকভাবে জানতে হবে। এখন আমরা যদি তালাকের ক্ষমতা পুরুষকে এককভাবে দেওয়ার যে ক্ষতি বা উপকারিতা আছে, তার সাথে তাকে তালাকের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা বা অন্য কারো সাথে যৌথভাবে ক্ষমতা দেওয়ার উপকারিতা বা ক্ষতির সাথে তুলনা করি, তাহলে দেখা যায় যে, প্রথমটির ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক বেশী। আর এ দ্বারাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তালাকের নিরংকুশ ক্ষমতা প্রদানের জন্য পুরুষকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আরো একটি অভিযোগ ও তার জবাব

আরো একটি অভিযোগ বহু বছর ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে। সেটি হলো, তালাকের কিছু কিছু বিধি এমন রয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে স্ত্রীরই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে এবং তার প্রতি সুবিচার ও তার ক্ষতিরোধ নিশ্চিত করেনা। যেমন, একবারেই তিন তালাক দেয়া, স্বামী এত রাগান্বিত যে তার কোন জ্ঞান নেই এমন অবস্থায় তালাক দিলেও তা কার্যকরী হওয়া এবং জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেলেও স্বামীর দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার থেকে স্ত্রীর নিষ্কৃতি লাভে অক্ষমতা। হাজার অনুনয় বিনয় করলেও স্বামী শেষোক্ত অবস্থায় তালাক দিতে অস্বীকার করে। অথচ স্ত্রী এর কোন প্রতিকার করতে সমর্থ হয়না।

এ ধরনের পরিস্থিতি এক সময় আমাদের সমাজে ছিল এবং এ অভিযোগ অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, তা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আল কুরআন ও হাদীসে তালাকের বিধানটি যেভাবে আছে, তার কারণে এটা হয়নি। বরং চারটি মাযহাবের একটির ওপর অনমনীয় থাকার কারণে এটা হয়েছে।

এজন্য সংস্কারবাদী মুসলিম চিন্তানায়কগণ নারীর এই সব কষ্ট দূর করার জন্য চার মাযহাবের ওপর সম্মিলিতভাবে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং চার মাযহাবের সম্মিলিত বিধিব্যবস্থার আলোকে অসচ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও যুলুমবাজ স্বামীর হাত থেকে নারীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উপায়

www.amarboi.org

অনুসন্ধান করছেন। ইতিমধ্যে সিরিয়া মিসর ও অন্য কয়েকটি দেশে এমনভাবে আইনের সংস্কার সাধিত হয়েছে যে, স্বামীর হাতে তালাকের একক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত অভিযোগের অনেকখানি নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। তথাপি আমি মনে করি, এখনো কিছু অভিযোগ রয়েছে এবং চার মাযহাবের বিধিসমূহের আলোকে এখনো তার প্রতিকার করা সম্ভব।

এই সব আইনগত সংস্কার সাধিত হয়েছে আমার ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৫ নং সমাধানের ভিত্তিতে। সেটি হলো, তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাতেই থাকবে, কিন্তু যে স্বামীকে স্ত্রী ঘোরতর অপছন্দ করে কিংবা যে স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, সেই স্বামীর কাছ থেকে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ স্ত্রীকে দিতে হবে। (এ ব্যাপারে খুলা'র মাধ্যমে স্ত্রীর উদ্যোগে তালাক গ্রহণ বা পূর্বাহ্নে স্বামী কর্তৃক তালাক 'তাফভীয' তথা তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা হানাফী মাযহাবে চালু রয়েছে। বর্তমানে এ ব্যবস্থা প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশেই বিধিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে আলোচনা পরে আসছে। - অনুবাদক) এভাবে ইসলামী নৈতিকতার সাথে মানানসই নয়, স্বামীর এমন স্বৈরাচার থেকে স্ত্রীকে মুক্তি দেয়া সম্ভব- বিশেষত এ যুগে যখন ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুতর অধ:পতন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তালাকের ব্যাপারে আইনগত সংস্কার

এ পর্যায়ে আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরছি।

১- তালাকে রজয়ী (প্রত্যাহার যোগ্য) বানানো ঃ

নিম্নোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত তালাককে পুরোপুরিভাবেই রজয়ীতে পরিণত করা উচিত ঃ

(ক) পর পর দুটি তালাক দেয়ার পর যখন তৃতীয় তালাকও দেয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে তৃতীয় তালাক তাৎক্ষণিকভাবে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সংঘটিত করবে।

(খ) আকদের পর স্বামী স্ত্রীর নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক সংঘটিত হওয়া।

এ ধরনের তালাকও প্রত্যাহারযোগ্য থাকেনা এবং এতে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

(গ) স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে খুলা তালাক লাভ।

(ঘ) যৌন ব্যাধি বা অক্ষমতাজনিত কারণে বিচ্ছেদ।

(ঙ) স্বামী স্ত্রীর অবনিবনাজনিত বিচ্ছেদ।

এ ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকে হানাফী মযহাব অনুসৃত হয়ে আসছে। কেউ যদি আভাসে ইংগিতে তালাক দেয়, অথবা তালাক শব্দটির সাথে এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করে, যাতে তালাকের ইচ্ছার অনমনীয়তা ও উগ্রতা প্রকাশ পায়, তবে তাকে বায়েন তালাক বিবেচনা করা হয়। যেমন কেউ বললো ঃ তুমি আমার ওপর হারাম, অথবা তুমি আমার নিকট একজন নিষিদ্ধ বা বেগানা মহিলা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বায়েন তালাক সংঘটিত হবে। বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহারের কোন সুযোগ থাকবেনা। নতুন করে মোহরানা স্থির করে আক্দ করে বিয়ে দোহরাতে হবে।

www.amarboi.org

কিন্তু অন্যান্য মযহাব এত কঠোরতার পক্ষপাতী নয়। বরং উপরোক্ত পাঁচটি ক্ষেত্র ব্যতীত আর সব তালাকেই রজয়ী তালাক ঘোষণা করে। এতে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করা যাবে এবং নতুন করে মোহরানা স্থির করে আকদ করে বিয়ে দোহরাতে হবেনা।

২- এক সাথে একই বাক্যে তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাক বিবেচনা করা উচিত। এ ব্যাপারে হানাফী মযহাবের মত এই যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই সংঘটিত হবে। এই মত অনুসৃত হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ দীর্ঘকাল জটিল সমস্যায় ভুগছে এবং কলংকজনক 'হীলা' প্রথা চালু হয়েছে, যার কথা ভাবতেও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়।

কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী, এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়েমের ন্যায় বহু সংখ্যক মনীষীর অভিমত উক্ত মত থেকে ভিন্ন। তাদের মত এই যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাকই সংঘটিত হবে। এই শেষোক্ত মত অনুসারে সিরিয়া ও মিশর সহ কতিপয় মুসলিম দেশে আইন প্রণীত হয়েছে ও চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে উক্ত দুই মতের সমর্থকরা কী কী যুক্তিপ্রমাণ পেশ করেন তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনা। তবে আমি সকল মহলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, আল কুরআনের তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টতই শেষোক্ত মতটিই অভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, তালাকের সংখ্যা তিনে নির্ধারণের উদ্দেশ্যই এই যে, প্রথম তালাক ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপোষ ও আন্তরিকতা ফিরে আসার সুযোগ ও অবকাশ সৃষ্টি হোক। আল্লাহ সূরা আল বাকারায় বলেন ঃ

"তালাক দুবার। এরপর হয় ভালোয় ভালোয় (স্ত্রীকে) রেখে দিতে হবে, নচেত ভদ্রভাবে বিদায় করে দিতে হবে।" এরপর আল্লাহ পুনরায় বলেন ঃ "এরপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, (অর্থাৎ ৩য় বার) তাহলে এরপর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার জন্য আর বৈধ থাকেনা।"

এ আয়াত দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য ভাষায় বলছে যে, তালাক মূলত একটা পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া, এককালীন নয়। প্রথমে তালাক সংঘটিত হবার পর স্বামীর কর্তব্য হবে স্ত্রীকে ভালোয় ভালোয় রেখে দেওয়া, অর্থাৎ প্রত্যাহার করা, নচেত শান্ত ও ভদ্রভাবে বিদায় করে দেয়া। পুনরায় দ্বিতীয় তালাকের পর একইভাবে হয় ভদ্রভাবে রেখে দিতে হবে, নচেত বিদায় করে দিতে হবে। এরপরও যখন ব্যাপারটা তৃতীয় তালাকে গড়াবে, তখন আর ঐ স্ত্রী ভিন্ন স্বামীর ঘর না করা পর্যন্ত তার জন্য বৈধ হবেনা।

আল কুরআনের আলোকে সুস্পষ্টভাবে এই হলো তালাকের প্রক্রিয়া। স্বামী যদি একই নিঃশ্বাসে একই বাক্যে ও এক মুহূর্তের মধ্যে তিনটে তালাক দিয়ে স্ত্রীর সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহলে এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব হবে?

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা সূরা তালাকে বলেন ঃ "হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন ইদ্দত পর্যন্ত তালাক দাও এবং ইদ্দত গুণতে থাকো। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিওনা এবং তাদেরও বের হওয়া উচিত নয়। তবে তারা সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করলে সে কথা স্বতন্ত্র। এ হচ্ছে আল্লাহর সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করে। তুমি জাননা, হয়তো আল্লাহ এরপরও কিছু ঘটাবেন। যখন তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদ শেষ করবে, তখন তাদেরকে হয় ভদ্রভাবে রেখে দিও, নচেত ভদ্রভাবে বিদায় করে দিও।"

এ আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে জানায় যে, তালাকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া জরুরী। আরো জানা যায় যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে স্বামী গৃহেই থাকতে হবে এবং আল্লাহ কিছু ঘটাতে পারেন এই সম্ভবনার পরিপ্রেক্ষিতে তার ঐ বাড়ী থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ কিছু ঘটাতে পারেন এ কথার সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, স্বামী স্ত্রীর মনের মেঘ কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে এবং উভয়ে দাম্পত্য জীবনে পুনর্বহাল হতে পারে। অতঃপর ইদ্দত শেষ হলে হয় স্বামী তালাক দেয়া স্ত্রীকে রেখে দেবে। অর্থাৎ স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহাল করবে, নচেত তাকে বিদায় করে দেবে। আল্লাহ এ আয়াত কয়টিতে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহর এই সীমার মধ্যে থেকে যে কাজ করবেনা, সে নিজের ওপর যুলুম করবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এক বাক্যে ও একই সাথে তিন তালাক দেয়া হলে এবং তাকে কার্যকর করে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানো হলে উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়ন করা কি সম্ভব?

এরূপ বিচ্ছেদ ঘটানো হলে আর কি ভিন্ন কিছু ঘটার আশা অবশিষ্ট থাকে? এরপর তাকে ভদ্রভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ কি আর থাকে?

এ আয়াতগুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, আল্লাহ দাম্পত্য জীবনকে তাৎক্ষণিকভাবে তছনছ করে দেয়ার জন্যই তালাকের বিধান দেননি। বরং এ কাজটাকে কয়েক পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক পর্যায় অতিক্রম করার পর পুনর্বিবেচনা ও আপোষ করার সুযোগ রেখেছেন। একসাথে তিন তালাক কার্যকরী করলে এই সুযোগ থাকেনা।

সিরিয়া ও মিশর সহ যে দেশগুলো এই মত অবলম্বন করেছে তারা 'তাহলীল' ও অনুরূপ অন্যান্য লজ্জাজনক পাপাচার ও অনৈসলামিক প্রথা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

মাতাল, অচেতন ও বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক

যে কোন কাজের গোড়ার কথা হলো, আইনগতভাবে তার যোগ্যতা থাকতে হবে। আর এই যোগ্যতা বলতে বুঝায় বয়োপ্রাপ্ত হওয়া সজ্ঞান ও সচেতন অবস্থায় থাকা একং কাজটি সেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে করা। এ জন্য সাধারণ মূলনীতি এটাই হওয়ার কথা যে, মাতাল অবস্থায় ও কারো দ্বারা বলপ্রয়োগের শিকার হয়ে তালাক দিলে সে তালাক হবেনা। মাতাল

www.amarboi.org

ব্যক্তির তালাক হবেনা এ জন্য যে, সে তালাক শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তার বোধশক্তি স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকেনা এবং তার কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। আর যে ব্যক্তি বল প্রয়োগের শিকার হয় সে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে তালাক দেয়না বলে তার তালাক হয়না।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মযহাব বা মত এই যে, মাতালের তালাক শুদ্ধ। তিনি এটাকে তার মাতলামির শাস্তি হিসাবে বিবেচনা করেন, যাতে সে আর মাতলামি না করে। তবে বাস্তবতা এইযে, এ রায় মাতালদের মাতলামি মোটেই বন্ধ করতে পারেনি। উপরন্তু এ শাস্তি বেচারী স্ত্রীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়ে পড়েছে, যার দোষ হয়তো এটাই যে, সে তার স্বামীকে মদখুরীর জন্য তিরস্কার করেছিল, তাই সে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী, আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম মালেকের মতটাই নির্ভুল যে, মাতালের তালাক অশুদ্ধ ও অচল।

বলপ্রয়োগের শিকার হ'য়ে যে ব্যক্তি তালাক দেয়, তার তালাকও উক্ত তিন ইমামের মতে শুদ্ধ হবেনা। কেননা এখানে নিজের ইচ্ছার কোন হাত ছিল না। ইমাম আবু হানিফা এখানেও তালাক শুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

কিন্তু অচেতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবস্থাটা ঠিক এর বিপরীত। অত্যধিক ক্রোধের বশে অথবা রোগব্যাধির কারণে যে ব্যক্তির চেতনা তথা হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং মুখে কী বলছে, তা বুঝতে পারেনা, তার তালাক উক্ত তিন ইমামের মতে শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে অশুদ্ধ। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল।

শর্তযুক্ত তালাক

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি যদি অমুক কাজ কর, তবে তুমি তালাক হয়ে যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রী ঐ কাজ করলে আদালত এ যাবত তালাকের পক্ষেই রায় দিত। কিন্তু ইমাম দাউদ যাহেরী এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবের একাংশ এ ব্যাপারে নিম্নরূপ অভিমত দেন ঃ

উদাহরণ স্বরূপ সে যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি বাপের বাড়ী গেলে তালাক হয়ে যাবে, তা হলে আদালত তার কাছে জানতে চাইবে যে, বাপের বাড়ী গেলে সত্যিই তার তালাক দেয়ার অভিপ্রায় ছিল, না তাকে শুধু বাপের বাড়ী যাওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখার জন্যই একথা বলেছে। যদি বাপের বাড়ী যাওয়ার নিষেধাজ্ঞাকে কঠোরতর করার অভিপ্রায়েই এ কথা বলে থাকে এবং তালাক দেয়ার অভিপ্রায় না থেকে থাকে, তাহলে বাপের বাড়ী গেলে তালাক হবেনা। বরঞ্চ তার কথাটা কেবল কঠোরতা আরোপের অর্থেই গৃহীত হবে। কথাটা শপথ করে বললে শপথ ভাংগার জন্য যে কাফফারা নির্ধারিত আছে, এ ক্ষেত্রে সেই কাফফারা দিতে হবে। আর যদি তার অভিপ্রায় তালাক দেয়াই হ'য়ে থাকে তবে বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় থেকে তালাক হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

যেহেতু অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের কথা দ্বারা তালাক দেয়ার পরিবর্তে কড়াকড়ির অভিপ্রায় পোষণ করে থাকে, তাই উপরোক্ত অভিমত অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। কেননা এটাই সহজতর পন্থা এবং তালাকের ন্যায় একটা অনভিপ্রেত জিনিসের পরিধি সংকোচনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

তালাকে তাফভীজ

আমরা আগেই বলে এসেছি যে, আকদের সময় স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার হাতে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের শর্ত আরোপ করা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে জায়েজ। যেহেতু এই অভিমতটি স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষায় এবং স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে সহায়ক, সেহেতু এই শর্তটি যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

স্বামী নিখোঁজ হলে

স্বামী যদি একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে তার স্ত্রীর কী গতি হবে?

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে স্বামী ফিরে আসা কিংবা আদালতে তার মৃত্যুর রায় দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে তার নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। তবে আদালত কখন তার মৃত্যুর পক্ষে রায় দেবে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মযহাবের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত এই যে, তার সমবয়সীদের মধ্য থেকে যিনি প্রবীণতম, তার মৃত্যু হলেই আদালত স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে বলে রায় দেবে। অন্যরা বলেন, তার বয়স আশি বছর হওয়ার পর আদালত তার মৃত্যুর পক্ষে রায় দেবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে সর্বোচ্চ চার বছর পর ঐ স্বামী থেকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। এই দুই মযহাবের কেউ কেউ আবার সর্বোচ্চ তিন বছর, এক বছর ও ছয় মাস মেয়াদ নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মত গ্রহণ করলে স্ত্রীর বিরাট ক্ষতি ও কষ্ট অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা তাকে স্বামীর আশি বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর ইদ্দত পালন করতে হবে এবং তারপর অন্য পুরুষের সাথে তার বিয়ে বৈধ হবে। প্রশ্ন এই যে, এর পর তাকে কে বিয়ে করবে? আর এত দীর্ঘকাল তাকে ধৈর্য ধারণ করতে ও একাকীনী জীবন যাপন করতে আমরা বাধ্য করবো কিসের ভিত্তিতে! ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতানুসারে আদালত তার স্বামীর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করার আগে হয়তো বা স্ত্রীর মৃত্যুই ঘটে যাবে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের রায় গ্রহণ করাই স্ত্রীর জন্য সহজতর ও নিরাপদতর। তাই তিন বছরের বেশী কোন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া নিখোঁজ থাকা কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করা স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার

www.amarboi.org

সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশের আইনে স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে। এই সময়ে সে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নিজের খোরপোশ গ্রহণেরও হকদার।

উক্ত আইনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই বিচ্ছেদ তালাকে রজয়ী বলে গণ্য হবে। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে এলে বা জেল থেকে মুক্ত হলে সে তালাক প্রত্যাহার করতে পারবে।

প্রবাসী স্বামীকে নিখোঁজ ঘোষণা করার শর্ত এই যে, তার অবস্থানস্থল অজ্ঞাত হতে হবে অথবা এমন স্থান হতে হবে যেখানে যোগাযোগ করা ও তথ্যের আদান প্রদান করা সম্ভব নয়।

নিখোঁজ ঘোষণা করার জন্য নিখোঁজ হওয়ার ন্যায়সংগত কারণ না থাকাও একটা শর্ত। কেননা এ দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, সে স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়েই নিখোঁজ হয়েছে। ন্যায়সংগত কারণে যেমন ইসলামী জ্ঞান অর্জন বা ইসলামী জ্ঞান বিতরণ বা এর সহায়তাকল্পে, অথবা আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে নিখোঁজ হলে স্ত্রী বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকারী হবেনা। কেননা সে তার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিখোঁজ হয়নি।

খোরপোশ না দেয়ার কারণে তালাক

স্বামী যখন স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়া বন্ধ করে দেয়, তখন ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের মতে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েজ। তাদের প্রমাণ আল কোরআনের এই উক্তি ঃ "তাদের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখোনা সীমা অতিক্রম করার অভিপ্রায়ে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৩১)

বস্তুতঃ তালাকও না দেয়া আর খোরপোশও না দেয়া স্ত্রীর ওপর নিদারুণ অত্যাচার বটে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মত এই যে, শুধু খোরপোশ না দিলেই বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েজ হবেনা। তার যুক্তি এই যে, স্বামীর দু'রকম অবস্থা থাকতে পারে ঃ হয় সে বিত্তশালী, না হয় দরিদ্র। যদি দরিদ্র হয়, তবে তো খোরপোশ না দিলে তাকে যালেম বা অত্যাচারী বলা যাবেনা। কেননা আল্লাহ সূরা তালাকের ৭ নং আয়াতে বলেন, "সচ্ছল ব্যক্তির উচিত তার সচ্ছলতা অনুপাতে খোরপোশ দেয়া। আর যে অসচ্ছল, তাকে আল্লাহ যতটুকু সম্পদ দিয়েছেন তা থেকেই খোরপোশ দেয়া উচিত। আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেন না। আল্লাহ অচিরেই অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা দেবেন।" ইমাম আবু হানিফা বলেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে যখন যালেম সাব্যস্ত হয়না, তখন তার ওপর তালাক চাপিয়ে দিয়ে আমরা তার ওপর যুলুম করতে পারিনা। আর সে যদি সচ্ছল হয়, তবে নিসন্দেহে তার খোরপোশ না দেয়া যুলুম। কিন্তু বিচ্ছেদ দ্বারাই এই যুলুমের প্রতিকার করতে হবে—এটা জরুরী নয়। বরং এই যুলুমের প্রতিকারের অন্যান্য উপায়ও আছে। যেমন ঃ জোরপূর্বক তার সম্পদ বিক্রি করে তার স্ত্রীর

www.amarboi.org

খোরপোশ আদায় করা যায়। এমনকি তাকে খোরপোশ দিতে বাধ্য করার জন্য তাকে কারাগারেও পাঠানো যায়। মোটকথা, তার মতে যুলুম দ্বারা যুলুম প্রতিরোধ করা যায়না।

প্রাচীনকালে ইমাম আবু হানিফার মত অনুসারেই এ জাতীয় বিবাদ মেটানো হতো। কিন্তু বর্তমান আইনে স্ত্রীর নিরপেক্ষতার স্বার্থে এবং তাকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার স্বার্থে বাকী তিন মযহাবের রায় অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

রোগ ব্যাধি জনিত তালাক

বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো দম্পতির মনে শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কোন গুরুতর রোগব্যাধি থাকলে এই শান্তি বিঘ্নিত হয়। বিয়ের পর এ ধরনের ব্যাধি দেখা দিলে কি ব্যবস্থা নেয়া যাবে, সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়।

রোগ ব্যাধি দু' রকমের হতে পারে ঃ

(১) যৌনব্যাধি। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে এমন কোন রোগ বা অক্ষমতা থাকা, যা যৌন মিলনকে অসম্ভব করে তোলে।

(২) এমন কোন ব্যাধি, যা যৌন মিলনে বাধা দেয়না, কিন্তু ঘৃণার সৃষ্টি করে, ক্ষতি সাধন করে অথবা সংক্রমিত হয় এবং ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া রোগী বা রোগিনীর সাথে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, যেমন উন্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ, যক্ষা ও সিফিলিস।

উপরোক্ত রোগগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন মযহাবের মতামতে যথেষ্ট বিভিন্নতা রয়েছে।

যাহেরী মযহাবের মতে, কোন রোগেই স্বামী স্ত্রীর কারো পক্ষেই বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন জানানোর অধিকার নেই। তবে এই মতটি ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ জন্য বার ইমামসহ মুজতাহিদ ইমামগণের কেউই এটাকে সমর্থন করেননি।

ইবনে শিহাব যুহরী, আবু সাওর ও শুরাইহ প্রমুখ একদল বিজ্ঞ আলেমের মতে, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন পুরানো ও দুরারোগ্য ব্যাধি অথবা শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি থাকলে বিয়ে ভেংগে দেয়া জায়েজ। কেননা উভয়ের এ জাতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার ভিত্তিতেই বিয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। (কেননা বিয়ের আগে এসব জানাজানি হলে সাধারণতঃ বিয়ে হয়না। - অনুবাদক)

তাই বিয়ের পর যখন জানা যাবে যে, উভয়ে এই ধরনের গুরুতর ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়, তখন অপর পক্ষের চুক্তি ভংগের অধিকার থাকবে। নিসংকোচে বলা যায় যে, এ মতটি শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মত এই যে, যৌনব্যাধি স্ত্রীর মধ্যে থাকলে পুরুষের বিয়ে ভাংগার অধিকার থাকবেনা। কারণ তার হাতে তালাকের ক্ষমতা তো আছেই এবং তা সে যে কোন সময় প্রয়োগ করতে পারে। আর যদি স্বামী যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে তবে শুধু পুরুষত্বহীনতা, খাসি হওয়া ও কর্তিত জননেন্দ্রিয় সম্পন্ন হওয়া— এই তিনটি অবস্থাতেই স্ত্রী বিয়ে ভেংগে দেয়ার আবেদন জানাতে পারবে। কিন্তু যৌনব্যাধি

www.amarboi.org

ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধির ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী কারোই বিয়ে ভেংগে দেয়ার আবেদন জানানোর অধিকার থাকবেনা, চাই তা যক্ষা অথবা সিফিলিসের ন্যায় ঘৃণার উৎপত্তিকারী ও সংক্রামক ব্যাধিই হোক না কেন।

তবে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের এই মত শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিশীল নয়।

ইমাম মুহাম্মাদের মতে স্ত্রী যে ধরনের রোগেই আক্রান্ত থাকুক বিয়ে ভংগের আবেদন জানানোর অধিকার স্বামীর থাকবেনা। কেননা তার তালাকের ক্ষমতা রয়েছে এবং তা সে যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। আর স্বামী যদি যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, অথবা এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, যা যৌনব্যাধি নয় কিন্তু সেই রোগ থাকা অবস্থায় তার সাথে একত্রে বসবাস করা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহলে স্ত্রী বিয়ে ভেংগে দেয়ার আবেদন করতে পারবে। আমার মতে, শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে এই মতটি সবচেয়ে বেশী সংগতিশীল এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য অধিকতর নিরাপত্তাদায়ক।

এটা খুবই বিস্ময়কর যে, কোন কোন মুসলিম দেশে এমন আইন জারী রয়েছে, যা স্ত্রীকে যক্ষা, কুষ্ঠ, অংগহানি, সিফিলিস প্রভৃতি ঘৃণ্য ও সংক্রামক রোগাক্রান্ত স্বামীর কাছ থেকে বিয়ে বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়না। সেখানে মুসলিম আইন প্রণেতারা ভেবে দেখেনি যে, স্ত্রীরা কিভাবে এসব রোগে আক্রান্ত স্বামীর ঘর করবে এবং কিভাবে তাকে মন দিয়ে ভালোবাসবে এবং কিভাবেই বা এ ধরনের পরিবারে মানসিক শান্তি আসতে পারে? অথচ নারীদের অনুভূতি এত নাজুক হয়ে থাকে যে, এ ধরনের ঘৃণ্য ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত পুরুষ সহবাসে সক্ষম হলেও তার সাথে বসবাস করার চেয়ে সহবাসে অক্ষম পুরুষের ঘর করতেও তারা প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে এবং তাকে অধিকতর সহনীয় মনে করে থাকে।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"শুধুমাত্র দুইটি বা ছয়টি বা সাতটি যৌনব্যাধিকেই ঘৃণা উৎপাদনকারী রোগ মনে করার কোন যুক্তি নেই। কেননা স্বামী বা স্ত্রীর অন্ধ হওয়া, বোবা হওয়া, হাত কাটা, পা কাটা বা নাক কাটা বা কানকাটা হওয়া সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য জিনিস। বিয়ের সময় এসব জিনিস সম্পর্কে নীরব থাকা সবচেয়ে জঘন্য ধরনের ধোকাবাজী ও জালিয়াতী এবং ইসলাম বিরোধী কাজ। বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় কোন রোগের উল্লেখ না করা দ্বারা ত্রুটিমুক্ত থাকাই বুঝায় এবং রীতি অনুসারে তা একটা শর্তের পর্যায়ে পড়ে। হযরত উমর যখন জানলেন যে, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করেছে অথচ তার কোন সন্তান হচ্ছেনা, তখন তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে দাও যে তুমি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম এবং তাকে স্বাধীনতা দিয়ে দাও। (অর্থাৎ তাকে বিয়ে ভেংগে অন্য স্বামী গ্রহণের অথবা বিয়ে বহাল রাখার মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে দাও।)

যদিও বন্ধ্যাত্ব তেমন কোন সংক্রামক, ঘৃণার উদ্রেককারী কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকারক কোন রোগ বালাই নয়, তবুও এর সম্পর্কে যদি হযরত উমরের এই মত হ'য়ে থাকে, তাহলে

www.amarboi.org

এই সমস্ত ভয়ংকর অনিষ্টকর, ও সংক্রামক রোগের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন তা সহজেই বোধগম্য। এর ভিত্তিতে কিয়াস করে বলা যায় যে, এমন কোন ত্রুটি যা স্বামী বা স্ত্রীকে বিরক্ত করে এবং বিয়ের উদ্দেশ্য অর্জনে অর্থাৎ ভালোবাসা ও প্রেম সৃষ্টিতে সফলতা অর্জন করতে দেয়না, তাতে বিয়ে বাতিল করা বৈধ হয়ে যায়।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

"ইসলামী শরীয়তের উৎস, তার উপাদান, তার ন্যায়নিষ্ঠতা, তার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তাগবেষণা করবে, তার কাছে অস্পষ্ট থাকবেনা যে, এই অভিমতই অগ্রগণ্য এবং শরীয়তের বিধির সাথে সামঞ্জস্যশীল।"

মোদ্দাকথা এই যে, এই আইনের এমন সংশোধন হওয়া প্রয়োজন যাতে যে কোন সংক্রামক ও ঘৃণা উদ্রেককারী ব্যাধিতে দম্পতির একজন আক্রান্ত বলে জানা গেলে অপরজন বিয়ে ভংগ করার দাবী জানাতে পারবে। এটাই শরীয়তের বিধি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সংগতিশীল।

অবনাবনি জনিত বিচ্ছেদ

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, স্বামী স্ত্রীর অবনিবনার কারণ নির্ণয় ও দূর করার জন্য ইসলাম স্বামীর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি শালিশী কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে।

আমাদের দেশের (সিরিয়ার) আইনে বলা হয়েছে যে, স্বামী কিংবা স্ত্রী যখন তার অপর জীবনসংগীর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করার অভিযোগ তুলবে, তখনই এই শালিশী কমিটি গঠন করতে হবে। এরপর ঐ শালিশী কমিটি আদালতের কাছে দম্পতির অবনিবনা বা বিবাদ বিসম্বাদের কারণ সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দেবে। কমিটি যদি তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্য কোন প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে আদালত বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেনা। আর যদি কমিটি বিচ্ছেদের প্রস্তাব দেয়, তবে আদালত বিচ্ছেদ ঘটাবে। এই বিচ্ছেদ এক তালাকে বায়েন বলে গণ্য হবে। দুর্ব্যবহারের জন্য স্বামী দায়ী সাব্যস্ত হলে মোহর দিতে হবে, আর স্ত্রী দায়ী হলে মোহর দিতে হবেনা। এ বিধান ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মযহাব থেকে গৃহীত। হানাফী ও শাফেয়ী মযহাবে অবনিবনার (অন্য কোন কারণ না থাকলে) কারণে বিচ্ছেদ বৈধ হবেনা। কিন্তু সামগ্রিক বিচার বিবেচনায় মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের বিধানই সঠিক। কেননা অব্যাহত ও স্থায়ী অবনিবনা ও বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে দাম্পত্য জীবন সঠিকভাবে চলতে পারেনা। উপরন্তু সন্তানদের লালন পালন ও তাদের স্বভাব চরিত্রও এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হ'য়ে পারেনা। স্বামী স্ত্রীর এই অবনিবনা বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার সকল চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে তার কারণ গুরুতরই হোক বা মামুলী হোক, এ ধরনের দম্পতির দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটানোই কল্যাণকর। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের উভয়ের জন্যই আরো ভালো জীবনসাথী জুটিয়ে দেবেন, যা তাদের অধিকতর সুখশান্তি ও স্থিতি নিশ্চিত করবে। যে দম্পতি ক্রমাগত ঝগড়াঝাটি করে নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছে এবং তাদের সম্পর্ক

www.amarboi.org

স্বাভাবিক করার সকল বিধিসম্মত চেষ্টা বিফল হয়েছে, সে দম্পতিকে অনর্থক একত্রিত করে রাখায় কোন মংগল থাকতে পারেনা।

অত্যাচারমূলক তালাক

ইতিপূর্বে যে কয় ধরনের তালাক বা বিচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পেছনেই কোন না কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। ফলে ওগুলো স্বামী অথবা স্ত্রী কারো না কারো স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু এবার যে তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অত্যাচারমূলক ও একেবারেই আগ্রাসী তালাক। নিম্নোক্ত দুইটি অবস্থায় সচরাচর এই তালাক সংঘটিত হতে দেখা যায় ঃ

(১) স্বামী যখন এমন রোগে আক্রান্ত হয় বা স্বাস্থ্যের এমন অবনতি ঘটে যে, তার বেঁচে থাকার আর আশা নেই এবং মৃত্যু অবধারিত বলে তার বিশ্বাস জন্মে, তখন সে যদি স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দেয়, তবে তা হবে অত্যাচারমূলক তালাক, যা আল্লাহর নিকটও খুবই ধিকৃত, আর নৈতিক দিক দিয়েও একেবারেই অমানবিক ও বর্বরোচিত কাজ।

এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঃ

ইমাম শাফেয়ীর মতে এরূপ তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবেনা। কেননা তালাকে বায়েন দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটায়। তাই স্বামীর মৃত্যুর সময়ে সে তার স্ত্রী ছিলনা। কাজেই সে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেনা। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দেয়া নিঃসন্দেহে গুনাহ। কিন্তু এই গুনাহর শাস্তি সে আল্লাহর কাছে পাবে। দুনিয়ার কার্যকলাপে তার কোন প্রভাব পড়বেনা।

অবশিষ্ট তিন ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতে, ইসলামের ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে এই ব্যক্তির শাস্তি হওয়া জরুরী। কেননা সে তার স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তালাক দিয়েছে। এর পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে এই তিন ইমাম ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানীফার মতে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবে, অন্যথায় পাবেনা।

ইমাম আহমাদের মতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করলে মৃত পূর্বতন স্বামীর উত্তরাধিকার পাবেনা, অন্যথায় পাবে, চাই স্বামীর মৃত্যু ইদ্দতের পরে হোক বা ইদ্দতের মাঝখানে।

ইমাম মালেকের মতে, সে সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকার পাবে, চাই স্বামী ইদ্দতের পরে মারা যাক কিংবা আগে এবং চাই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে থাকুক বা না থাকুক। এখানে দেখা যাচ্ছে, ইমাম মালেকের মত ইমাম শাফেয়ীর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাদের উভয়ের মতই প্রান্তিক। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ বিন হাম্বলের মত মধ্যপন্থী। সিরীয় আইন ইমাম আবু হানীফার মতটি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের

www.amarboi.org

মতটি গ্রহণ করছি এবং অধিকতর ন্যায়সংগত মনে করছি। আমি স্ত্রীকে শুধু ভিন্ন স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার না দেয়ার পক্ষে। কেননা সে তো শেষোক্ত স্বামীর উত্তরাধিকার পাবেই। কাজেই তাকে প্রথম স্বামীর উত্তরাধিকার দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

(২) আদৌ কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তালাক দেয়া। স্ত্রী দরিদ্র অথবা এত বুড়ী হতে পারে যে, তার পুনর্বিবাহ সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তার স্বামীবিহীন জীবন তার জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হ'য়ে দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্বামী নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গুনাহগার ও অপরাধী। কিন্তু এ ধরনের স্ত্রীকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান ছিলনা। সিরীয় আইনে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বামীকে বাধ্য করা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণিত হবে তার অত্যাচারের মাত্রা অনুপাতে।

এ ব্যবস্থাটা আমাদের আইনে এক নতুন দিক নির্দেশক। আমার যতদূর বুঝে আসে, আল কোরআনে এক শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যে 'মাত্‌য়া' দিতে নির্দেশ এবং অপর এক শ্রেণীকে মাত্‌য়া দিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, সেটাই এই ব্যবস্থার ভিত্তি। এই মাত্‌য়ার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। সংশ্লিষ্ট দেশ ও সমাজে প্রচলিত রীতি ও প্রথা দ্বারা এটা নির্ণিত হবে। আল কোরআনে একে 'মারূফ' অর্থাৎ ন্যায়সংগত শব্দ দ্বারা বিশেষিত হয়েছে, যা স্থান, কাল, দেশ ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সারকথা হলো, তালাকপ্রাপ্ত হ'য়ে স্বামীর বাড়ী থেকে সে যেন একেবারে খালি হাতে না যায়, তা নিশ্চিত করা চাই। এ ক্ষেত্রে আদালত নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা অনুপাতে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে পারবে।

নিঃসন্দেহে এ আইনগত ব্যবস্থা চমৎকার। এ দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। তবে সিরীয় আইনের এই বিধিতে একটি বিষয়ে আমার আপত্তি রয়েছে। সেটি এই যে, এতে ইদ্দতকালীন খোরপোশের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছে, তাতে শর্ত যুক্ত হয়েছে যে, তা যেন এক বছরের খোরপোশের চেয়ে বেশী না হয়। আমি মনে করি, একজন অত্যাচারী স্বামীকে তার মযলুম স্ত্রীর জন্য অন্ততঃ এতটুকু ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা দরকার, যাতে সে বিয়ের যোগ্যা হলে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং বার্ধক্যের কারণে বিয়ের আযোগ্যা হলে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে যেন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গুঁজে থাকতে পারে এবং জীবন ও ইজ্জত রক্ষার মত ন্যূনতম খাওয়াপরার উপকরণ লাভ করে। আর স্বামী এতটা করতে আর্থিকভাবে অক্ষম হলে, সে যতটা করতে সক্ষম, ততটা তার কাছ থেকে আদায় করে বাকীটা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে অর্পিত হওয়া উচিত। মোটকথা ইসলামী শরীয়তের ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা এটা বরদাশত করতে পারেনা যে, যে মহিলা তার গোটা যৌবন নিজ স্বামীর সাথে কাটিয়ে দিয়েছে, সে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে তার শেষ জীবনে খাওয়া, পরা ও আশ্রয়ের শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, অথচ তার অপদার্থ স্বামী তাকে তার জীবন সায়াহ্নে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদাটুকুও দিতে এগিয়ে আসবেনা।

www.amarboi.org

উপসংহার

এ পর্যন্তকার তালাক সংক্রান্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলাম তার নির্ধারিত আসল তালাক বিধিতে জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন ও সর্বকালের মানব সমাজের বাস্তব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে এবং নারীকে তালাকের সেই অরাজকতা, অব্যবস্থা ও উচ্ছৃংখলতা থেকে রেহাই দিয়েছে, যা আরবের জাহেলী সমাজে বিরাজ করতো। সেখানে তালাকের কোন সীমাসংখ্যা ছিলনা, নারীর কোন অধিকারের স্বীকৃতি ছিলনা এবং কোন ইদ্দতও মানা হতোনা। শুধু আরবে কেন, তৎকালে কোন সমাজই এ ব্যাপারে কোন নিয়মশৃংখলার ধার ধারতোনা।

আমরা এও জানতে পেরেছি যে, ইসলাম পুরুষকে তালাকের অধিকার দিলেও স্ত্রীকে তার করুণার পাত্রী করে রাখেনি। বরঞ্চ ইসলাম তার জন্য অত্যাচারী স্বামীর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। বিয়ের আক্‌দের সময়েই স্ত্রীর হাতে তালাকের অধিকার প্রদানের শর্ত আরোপের সুযোগ রেখে দিয়েছে। এ ছাড়াও ক্ষতিপূরণ দিয়ে খুলা তালাকের সুযোগ এবং অসহনীয় অবস্থায় আদালতের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। এমনকি পুরুষের পক্ষ থেকে অত্যাচারমূলক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম কিভাবে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও তার দুঃখ মোচন করতে এগিয়ে আসে, তাও আমরা দেখেছি। একমাত্র যে জিনিসটি অবশিষ্ট থাকে তা হলো স্বামীর তালাক দেয়ার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। এ ধরনের অপপ্রয়োগ আইনগতভাবে প্রতিহত করা দুনিয়ার কোন আইনের পক্ষেই সম্ভব নয়। এটা কেবল ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ, এবং বিবেকের সচেতনতা সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম এই প্রশিক্ষণের কাজটা এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকে এবং করতে সবাইকে উৎসাহিত করে থাকে যে, মানুষ শুধু তার স্ত্রী নয়, বরং আপন বা পর কোন মানুষের ওপরই যুলুম অত্যাচার ও অসদাচরণ করতে পারেনা। এ ব্যাপারে যাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রয়েছে, তাদেরকে আমি সারা বিশ্বের তালাকের পরিসংখ্যান পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। এতে তারা দেখতে পাবেন, ভণ্ডামী নয়, মুনাফেকী নয়, ধর্মব্যবসায় নয় এবং ধর্মীয় বাড়াবাড়ি নয়— বরং সত্যিকার ধর্মীয় ভাবধারাপুষ্ট সমাজগুলোতে তালাকের সংখ্যা কমতে কমতে কিভাবে প্রায় শূন্যের কোঠায় উপনীত হতে চলেছে।

www.amarboi.org

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

যদিও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছিল, তথাপি ইসলামের প্রথম যুগে রাজনীতির সাথে তাদের কোন সংশ্রব ছিলনা। রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের পর বনু সায়েদা গোত্রের মুক্তাঙ্গনে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত সলাপরামর্শের জন্য সাহাবীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কোন নারী যোগদান করেছিল বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের এটাও জানা নেই যে, নারীরা শাসন সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সাথে অংশ নিত। খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে পরামর্শের জন্য পুরুষদের যেমন বৈঠক আহবান করতেন, তেমনি নারীদেরও বৈঠক অনুষ্ঠিত করতেন-এমন কোন তথ্য আমাদের গোচরে আসেনি। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসেও আমরা এর কোন নজীর দেখতে পাইনা যে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক তৎপরতায় ও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনায় নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অবস্থান করতো।

সমগ্র ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে আমরা যেটুকু পাই তা হচ্ছে, রাসূল (সা) নারীদের হাতে হাত না রেখেই অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, সন্তান হত্যা করবেনা, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবেনা এবং রাসূল (সা) এর কোন ন্যায়সংগত আদেশ লংঘন করবেনা। এ অংগীকার গ্রহণ করা হয় মক্কা বিজয়ের দিনে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও একই অংগীকার গ্রহণ করা হয়।

এই অংগীকার গ্রহণের ঘটনাটাকে কেউ যদি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা হিসাবে গণ্য করে, তবে সে ভুল করবে এবং একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যাবেনা।

আমরা এ কথা জানি যে, কোন কোন সাহাবীর স্ত্রী রাসূল (সা) পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহে আহতদের সশ্রুষা ও পিপাসার্তদের পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের সাথে রণাংগনে চলে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা ও সেবাসুশ্রুষার জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকতেন এবং কোন মুসলমান যুদ্ধে আহত হলে রাসূল (সা) তাকে ঐ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এ তথ্যটাও নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। এটা কেবল নারীর রণাঙ্গনে সেবাসুশ্রুষা ও পানি খাওয়ানো এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধেও লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এ সব ব্যাপারে নারীর এখনো জড়িত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

আমরা এ কথাও বিলক্ষণ জানি যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকালে মুসলিম নারীর অবদান ও ত্যাগ তিতিক্ষা অসাধারণ ও বিপুল। হযরত উমরের বোন ও হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা প্রমুখের দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। এ দ্বারা

www.amarboi.org

প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে নারীর বিপুল প্রভাব রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অবদান রাখা তাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য এখনো বহাল রয়েছে। তবে এ যুগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে যা বুঝা যায়, তাতে অংশ গ্রহণের বৈধতা এ দ্বারা প্রমাণিত হয়না।

আমরা এও জানি যে, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় নরীরা পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে রাসূলের (সা) ঈদের খুতবা ও ওয়াজ শুনতে সমবেত হতো। কিন্তু এ দ্বারা তাদের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ প্রমাণিত হয়না। যারা এরূপ দাবী করে, তারা ভুল দাবী করে।

ইতিহাসের এক বিখ্যাত যুদ্ধ-উষ্ট্রযুদ্ধে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উটের পিঠে বসে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পরবর্তীতে হযরত আয়েশা নিজের এই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছিলেন এবং অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনগণ এ জন্য তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন। কেননা রাসূলের (সা) স্ত্রী হিসাবে নিজগৃহ থেকে বের হওয়া যে তাঁর জন্য বৈধ ছিলনা, সেটা কুরআনের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞার অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা ভুল ছিল এবং সে জন্য তিনি তওবা করেন ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। যুদ্ধের পর হযরত আলী তাঁকে সসম্মানে ও পূর্ণ নিরাপত্তাসহকারে মদীনায় তাঁর গৃহে পৌঁছিয়ে দেন। কাজেই হযরত আয়েশার এই পদক্ষেপ দ্বারা মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়না। কেননা এটা একেতো একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা। উপরন্তু এটা যে ভুল ছিল, সেটা খোদ হযরত আয়েশাই উপলব্ধি করেছিলেন।

ইতিহাসের কোন কোন যুগে কোন কোন নারী যে দেশের শাসক ও সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন এবং কেউবা নিজের স্বামীর ওপর প্রভাব খাটিয়ে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশীদার হয়েছিলেন, যেমন হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা, সেটাও আমাদের জানা। কিন্তু এ সবই ব্যতিক্রমী ও ব্যক্তিগত ঘটনা। তারা কেবল তাদের স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমেই শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। আজকের যুগের প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাঁরা অংশ নিতেন না।

সুতরাং এ কথা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম নারীরা অতীতে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করতো না এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীতেও তারা কোনই ভূমিকা পালন করেনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এর কারণ কী? আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, ইসলাম নারীর মর্যাদা বাড়িয়েছে, আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে পুরুষের সমান বানিয়েছে এবং তাদের জীবনের সকল ক্ষতি ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়েছে। এখানে ইসলামের ভূমিকাটা দৃশ্যত একটা স্ববিরোধী মনে হয়। তাই এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

www.amarboi.org

ইসলাম যদিও নারীর সকল হৃতঅধিকার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, এবং যদিও তার আইনগত ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা পুরুষের সমান নির্ধারণ করেছে, কিন্তু ইসলাম মনে করে যে, নারীর নিজের, তার পরিবারের ও গোটা সমাজের জন্য এটাই অধিকতর কল্যাণকর যে, সে পুরোপুরিভাবে কেবল পরিবারের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করবে। এজন্য ইসলাম তাকে সকল অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং তার ভরণপোষণের ভার তার স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। অথচ সে ক্রয় বিক্রয় এবং অর্থোপার্জনের যাবতীয় কাজের যোগ্য। ইসলাম নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের পর যেমন স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছে, তেমনি তার বিয়ের আগ পর্যন্ত ন্যস্ত করেছে তার পিতার ওপর। এটা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, সে তার মায়ের তদারকীতে যাবতীয় ঘরকন্নার কাজে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, পিতামাতার তদারকীতে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে সে যেন একটি নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ সময় মা তাকে প্রশিক্ষণ দেয়, আর পিতা তার ভরণপোষণ চালায়।

এরূপ প্রাজ্ঞ ও কল্যাণময় পন্থায় ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করে, এবং তার একটি অধিকারও ক্ষুণ্ন করেনা। অনুরূপভাবে, পরিবারের সুখশান্তিও সে এভাবে সংরক্ষণ করে। স্ত্রীকে বাড়ীর বাইরে ভিন্ন কোন কাজে যেমন ব্যবসায়, বাণিজ্যে, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিয়োজিত হতে সে বাধ্য করেনা।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইতিহাসের কোন যুগেই মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার রহস্যটা কী। অথচ তাকে এত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু সে বুঝেছে যে, জীবনে তার প্রথম কর্তব্য হলো উপযুক্ত মা ও গৃহিনী হওয়া। মুসলিম নারীর এই অবস্থান সুইজারল্যাণ্ডের নারীর সাথে তুলনীয়। সুইস নারীর সকল অধিকারই বহাল রয়েছে এবং রাজনৈতিক অধিকারসহ সকল অধিকারে সে পুরুষের সমান। তথাপি সে তা প্রয়োগ করেনা এবং করতে চায়ও না। কেননা সে রাজনীতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ময়দানে যাওয়ার চেয়ে পরিবার ও ঘরোয়া জীবন নিয়ে পড়ে থাকতেই বেশী ভালোবাসে।

আমাদের যুগে নারী ও রাজনীতি

পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম নারী এখন আর আগের মত স্বামী ও সন্তানদের পরিচর্যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এখন সে বা তার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মতের সমর্থকবৃন্দ এই মর্মে দাবী জানাতে আরম্ভ করেছে যে, পুরুষের মত তারও রাজনৈতিক অধিকার থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত, সিরিয়াসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার ও সংসদ সদস্য হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

যাহোক মুসলিম নারী যে ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার পেয়েছে, সেটা এখন একটা বাস্তব সত্য। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী, সেটাই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

www.amarboi.org

ভোটাধিকার

অনেক চিন্তাগবেষণা ও পর্যালোচনার পর দেখা গেছে যে, ইসলাম নারীকে ভোটাধিকার প্রদানে বাধা দেয়না। নির্বাচন হচ্ছে জনগণ কর্তৃক এমন কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করার নাম, যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও সরকারের তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং নির্বাচন বা ভোট দান মূলত প্রতিনিধি নিয়োগ করার নাম। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের পসন্দসই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই প্রতিনিধিরা প্রতিনিধি পরিষদে গিয়ে তাদের ভোটারদের পক্ষে কথা বলে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে। নারী যদি কোন ব্যক্তির ওপর তার অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায় এবং সমাজের একজন সদস্যা হিসাবে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা প্রদান করতে চায়, তবে নারীর এ কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তবে নারীকে ভোটাধিকার প্রদানের একমাত্র শর্ত হলো, ভোট দেয়ার সময় তাকে পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে না হয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ যে কাজ হারাম করেছেন, সেটা সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। যেসব মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার চালু হয়েছে, সেখানে মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা ভোট কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এই শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলারা সেখানে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বাড়ীতে ফিরে আসে এবং পর্দার বিধান ভংগ করে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে বা কোন হারাম কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়না।

জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার

ইসলামের নীতিমালায় নারীর ভোটাধিকার যখন স্বীকৃত, তখন তার জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকারও স্বীকৃত কিনা, সেটা এবার বিবেচনা করে দেখা যাক।

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগে জনপ্রতিনিধিত্বের ধারণাটা কী, তা আমাদের জানা দরকার। জনপ্রতিনিধিদের সাধারণত দুটো কাজ করতে হয় ঃ ১. আইন ও বিধিমালা রচনা করা। ২. সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করা।

আইন রচনার কাজ থেকে নারীকে নিবৃত্ত করার কোন কারণ ইসলামে নেই। কেননা আইন রচনায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান– এই উভয়বিধ জ্ঞানই এর আওতাভুক্ত। ইসলামে জ্ঞানার্জনে নারী ও পুরুষকে শুধু সমান অধিকারই দেয়না, বরং জ্ঞানার্জনকে উভয়ের জন্য ফরয বলে ঘোষণা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু বিদুষী মহিলা রয়েছেন, যারা হাদীস, ফেকাহ ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

এরপর আসে সরকারের নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধানের প্রসংগ। এ কাজটি দুই প্রকারের হতে পারে ঃ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ “মুমিন নারীগণ ও

www.amarboi.org

মুমিন পুরুষগণ পরস্পরের সহায়। তারা সৎ কাজে আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।"

সুতরাং আইন রচনা বা নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধান– এই দুই কাজের ক্ষেত্রেই নারীকে জন প্রতিনিধি হওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত করে– এমন কোন উক্তি ইসলামে নেই।

তবে বিষয়টি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের নীতিমালা ও আইন কানুন নারীর এই অধিকার প্রয়োগের পথে অন্তরায়। তার অযোগ্যতার জন্য নয় বরং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে এই অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

প্রথমতঃ পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নারীকে এই কাজে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োগের দাবী জানায় এবং এ কাজ থেকে তার মনোযোগ ছিন্ন করে এমন কোন কাজে অংশ গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ বেগানা পুরুষের সাথে মেলামেশা বিশেষত নিভৃতে মেলামেশা ইসলামে নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ ইসলামে নারীর দেহের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ তথা মুখমণ্ডল ও দুইহাত ব্যতীত উন্মুক্ত করা নিষিদ্ধ। (মুখমণ্ডল প্রকাশযোগ্য কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ আছে- অনুবাদক)

চতুর্থতঃ মুহাররম আত্মীয়ের সাথে ছাড়া একাকী নিজ শহরের বাইরে গমন নিষিদ্ধ।

ইসলামের উল্লিখিত চারটি নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করে জনপ্রতিনিধিত্ব হিসাবে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। একজন জনপ্রতিনিধিকে তা তিনি পুরুষ বা স্ত্রী যাই হোন না কেন– দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে কাটাতে হয়, তাকে সংসদ কক্ষের বাইরে সংসদ সদস্যদের সাথে মেলামেশা করতে হয়। দেহের যে অংশগুলো উন্মুক্ত করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, তাও নারীকে প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হয়। এবং তাকে নিজ শহরের বাইরেও একাকী সফরে যেতে হয়। এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন সংসদীয় সম্মেলনে যেতে হয়।

এ সব হারাম কাজকে হালাল বলার ধৃষ্টতা কোন মুসলমান দেখাতে পারেনা। নারী যদি জন প্রতিনিধি হবার যোগ্য হয়, তবে ইসলাম তাকে তা থেকে নিষেধ করেনা। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্বের কাজের প্রকৃতিই এমন যে, অনেক ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অন্যদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম তার আইন প্রণয়নের কাজে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কোন কাজ জনস্বার্থের অনুকূলে হলে তাকে বৈধ এবং জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হলে অবৈধ ঘোষণা করে।

এই জনস্বার্থের নিরীখে নারীর জনপ্রতিনিধিত্বকে বিবেচনা করলে এর উপকারিতার চেয়ে ক্ষতিই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

এর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, পরিবার ও সন্তানদের কল্যাণ উপেক্ষিত হয় এবং দলীয় বিতর্ক ও বিরোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবারের সংহতি ও ঐক্য ক্ষুণ্ন হয়। আমেরিকার এক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় স্বামী স্ত্রীতে মতবিরোধের পরিণতিতে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যার খবর অনেকেরই জানা আছে।

এ ছাড়া নারীর রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন যে কত কঠিন, তা কোন বিবেচক মানুষ অস্বীকার করতে পারেনা। জন্মগতভাবে সে অপেক্ষাকৃত আবেগপ্রবণ। প্রচারণা ও গুজব দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ভোটাধিকার প্রয়োগের সৌন্দর্য ও আর্থিক প্রলোভনেও সে আকৃষ্ট হয়।

তা ছাড়া সে যদি সুন্দরী হয়, তবে পুরুষদের ভোট পাওয়ার জন্য নিজের সৌন্দর্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। নির্বাচনী প্রচারণা, ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট প্রার্থনা এবং রাতের ঘুম হারাম করে দিন রাত পরিশ্রম করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা বুঝতে পারবে নারী প্রার্থী হলে তার কী ভোগান্তিই না হতে পারে। কিছু কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রে নারী ভোটারদের মধ্যে মারামারি, চুলোচুলি, পরস্পরকে ঘৃণ্য অপবাদের আদান প্রদান ইত্যাদির যে ন্যাক্কারজনক দৃশ্য আমি দেখেছি, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া ঘোরতর অরুচিকর। তবে যেসব মহিলা জনপ্রতিনিধিত্বকে সহজ ব্যাপার মনে করেন, তাদেরকে শুধু বলতে চাই যে, একজন নির্বাচন প্রার্থীকে ভোটারদের মন জয় করতে যে ঝামেলা পোহাতে হয়, তার চেয়ে বরং প্রশাসনিক পদে কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করা অনেক বেশী সহজ। নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট ভিক্ষার অভিযান আর যাই হোক, নারী প্রকৃতির পক্ষে মোটেই সহনীয় নয়। অথচ এসব বাদ দিয়ে নিছক প্রার্থী হয়ে ঘরে বসে থাকা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়।

আরো কথা আছে। নারীর মাতৃত্বের সম্ভাবনাকে আমরা কিভাবে উপেক্ষা করবো? জনপ্রতিনিধির মা হওয়াকে কি নিষিদ্ধ করা যাবে? তা করলে তো তার প্রকৃতির ওপর, তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপর এবং গোটা সমাজের ওপর যুলুম করা হবে। তাকে কি শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের ন্যায় তিন মাসের ছুটি দেয়া যাবে? না দিলে এই সময়ে তার কাছ থেকে স্বাভাবিক কাজ পাওয়ার আশা করা যায়না। কেননা এ সময় তার মেজাজ থাকে খিটখিটে। সব কিছু তার অপছন্দ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার তার ছুটির মধ্যে সংসদের পুরো একটা অধিবেশনও অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে।

আমি বুঝতে অক্ষম গুটিকয় মহিলাকে সংসদ সদস্যা না করলে একটি জাতির কী এসে যায়? তারা কি এমন কিছু জাতিকে উপহার দিতে পারেন, যা দিতে পুরুষেরা অক্ষম? তারা কি এমন কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারেন, যা পুরুষরা দিতে পারেনা? তবে কি শুধু মহিলাদের অধিকার দাবী করার জন্য তাদেরকে সংসদে পাঠানো হয়? যদি যথার্থই কোন অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে, তবে ইসলাম তা নিশ্চিত করবেই এবং প্রত্যেক

www.amarboi.org

পুরুষ সদস্যের তা সংসদে উত্থাপন করা কর্তব্য। আর যদি ইসলাম সেই অধিকারকে স্বীকার না করে, তবে কোন মুসলিম জাতি ও তার সংসদ সে দাবী মানতে পারেনা।

অনেকে বলেন, এর উদ্দেশ্য কেবল নারীর মর্যাদা সমুন্নত করা ও নারীকে তার মনুষ্যত্বের ব্যাপারে সচেতন করা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, সংসদ সদস্য না হতে পারলেই কি বুঝা যাবে নারীর কোন মর্যাদা নেই এবং সে মানুষ নয়?

আমাদের প্রচলিত আইনে বহু সম্মানিত নাগরিক রয়েছেন, যাদের রাজনীতি করা আইনত নিষিদ্ধ, যেমন সেনাবাহিনীর সৈনিক, সেনাপতি ও বিচারপতিগণ। এদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দানের অর্থ কি এই যে, তারা সম্মান ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে অন্যান্য নাগরিকদের চেয়ে নীচে? আমাদের আইনে কি সরকারী কর্মচারীদের ব্যবসায় করা নিষিদ্ধ নয়? তার অর্থ কি এই যে, তারা এ কাজে অযোগ্য?

জাতীয় স্বার্থে নাগরিকদের এক একটি শ্রেণীকে এক একটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, যা অন্যদেরকে করতে দেয়া হয়না। কিন্তু এটা তার সম্মান বা অধিকার কমানোর অর্থবোধক নয়। তা যখন নয়, তখন নারীকে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি না দেয়া জাতীয় স্বার্থের জন্য উপকারী বিবেচিত হলে তা তার জন্য অসম্মানজনক মনে হবে কেন? কৈ একজন সৈনিককে তো রাজনীতি থেকে হাত গুটিয়ে কেবল দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করলে সেটা তার জন্য অসম্মানজনক হয়না! সৈনিকের রাজনীতি বাদ দিয়ে শুধু দেশ রক্ষার কাজে এবং সরকারী কর্মকর্তা ব্যবসায় বাদ দিয়ে শুধু প্রশাসনে মনোযোগী হওয়া যতখানি জরুরী মায়ের শুধু মাতৃসুলভ দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হওয়াই কি সমাজের জন্য তার চেয়ে অধিক জরুরী নয়?

একটি স্পষ্টোক্তি

এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা উচিত। আমি এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই এবং মুসলিম উম্মাহকে বিপজ্জনক ভ্রান্ত পথ থেকে হুশিয়ার করতে চাই। এতে কেউ আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও নারীর শত্রু বলে আখ্যায়িত করবে কিনা, তার তোয়াক্কা আমি করিনা।

প্রথমতঃ নারীর সক্রিয় রাজনীতিপ্রীতি আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। যদিও পাশ্চাত্য তার পুনরুত্থানের কয়েকশো বছর পরই নারীকে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, পাশ্চাত্যবাসী এই অধিকার প্রয়োগের কী সুফল পেয়েছে?

এ ব্যাপারে পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পাশ্চাত্যবাসী বুঝতে পেরেছে যে, নারীকে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অধিকার দিয়ে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। বরঞ্চ এ দ্বারা পারিবারিক জীবনে ভাংগন ও বিচ্ছেদ নেমে এসেছে। এমনও হতে পারে যে, সেখানে নারীরা নিজেরাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনপ্রতিনিধিত্ব থেকে পিঠটান দিতে শুরু করেছে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়তঃ আমি প্রায় চারবার ইউরোপ সফর করেছি এবং প্রতিবার বিভিন্ন দেশে মাসের পর মাস অবস্থান করেছি। সাধারণভাবে সেখানকার রাজনৈতিক অংগনে এবং বিশেষভাবে আইন সভাগুলোতে নারীর কোন প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বলে আমি অনুভব করিনি। বৃটেনের কমন্‌স সভায় আমি একবার গিয়েছি এবং তার এক দীর্ঘ অধিবেশনে উপস্থিত থেকেছি। অথচ এই দীর্ঘ সময়েও কোন মহিলা প্রতিনিধিকে উপস্থিত দেখিনি। সকল মহিলা প্রতিনিধিই অনুপস্থিত ছিল।

তৃতীয়তঃ সুইস মহিলারা আজও স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকছে। এ প্রশ্নে যতবার গণভোট হয়েছে, মহিলাদের শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট পড়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যানের পক্ষে। অথচ সুইজারল্যাণ্ড পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় উন্নত দেশগুলোর অন্যতম। সেখানকার নারীরা প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল, অশিক্ষিত বা সেকেলে, একথা কেউ বলতে পারবেনা। অথচ কী আশ্চর্য, আমাদের প্রাচ্য দেশে কোন নারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেই তার সহপাঠিনী বা সহকর্মিনীরা তাকে এইসব গালি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনা।

এ জন্যই আমি অকুণ্ঠ চিত্তে ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, নারীর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ না করলেও প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে। এর কারণ রাজনীতিতে নারীর অযোগ্যতা বা অক্ষমতা নয়, বরং এর ফলে যে সামাজিক ক্ষতি অনিবার্য হয়ে ওঠে, ইসলামী নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের সাথে এর যে সুস্পষ্ট বিরোধিতা ও সংঘাত দেখা দেয়, পরিবারের নিরাপত্তা ও সংহতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় এবং সুস্থ ও শান্ত চিত্তে নিজের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে নারী যে বাধার সম্মুখীন হয়, সেটাই এর আসল কারণ।

www.amarboi.org

নারীর সামাজিক অধিকার

শিক্ষার অধিকার

মুসলিম সমাজে সাম্প্রতিককালে নারীরা সাধারণভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতো। অথচ ইসলাম শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কুরআন ও হাদীসের কোথাও একটি উক্তিও এমন নেই, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে বা নিরুৎসাহিত করে। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ইতিহাসে শত শত খ্যাতনাম্নী বিদুষী, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস ইত্যাদি ছিলেন এবং তাদের জীবনীও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই মুহূর্তে একজনের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করতে চাই। ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ, তোহফাতুল ফুকাহা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দীন সামারকান্দীর (মৃত সন ৫৩৯ হিঃ) কন্যা ফাতিমা। ইনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তাঁর পিতার সুযোগ্য শিষ্য, বিশ্ববিশ্রুত ফিকাহ্গ্রন্থ 'আল বাদায়ে ওয়াল্-সানায়ে' এর রচয়িতা আল্লামা আলাউদ্দীন আল কাসানীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। (কাসানীর ইন্তিকাল হয় ৫৮৭ হিজরীতে) তাঁর রচিত এই বিশালকায় গ্রন্থ আসলে তাঁর উস্তাদ ও শ্বশুর আল্লামা সামারকান্দীর তোহফারই সম্প্রসারিত ও বিস্তারিত রূপ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, 'তিনি তাঁর পুস্তকের ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করলেন।' ফাতিমা এতই অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন যে, তাঁর স্বামী ভুল করলে তিনি তা শুধরে দিতেন। তাঁর পিতার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে পিতা যে ফতোয়া দিতেন, তাতে পিতা ও কন্যা উভয়ের মতামত থাকতো। অতঃপর বাদায়ের লেখকের সাথে বিয়ে হলে ফতোয়ায় তিনজনের রায় থাকতো ঃ পিতার, কন্যার ও জামাতার।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক যুগে মুসলিম নারীদের নিরক্ষরতা মুসলিম জাতির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষিতা মা ও শিক্ষিতা স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে খুবই সহায়ক হবে।

তবে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য একই পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা মারাত্মক ভুল। কেননা শিক্ষা জীবনের পরবর্তী জীবনে একজন পুরুষের যা প্রয়োজন, নারীর তার প্রয়োজন নেই। কেননা নারী জন্মগতভাবে স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্য। তাই তার পরবর্তী জীবনে যা যা উপকারী, সেটাই তার শেখা কর্তব্য। দেশে দেশে আজ নারীদের উপযোগী অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরো হওয়া দরকার। বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচীতে বেশী পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যত জীবনে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়।

www.amarboi.org

চাকুরীর অধিকার

আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নারীর জন্য যে জিনিসটি নিষিদ্ধ করেছে তা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ। এর কারণও যথা স্থানে বিশ্লেষণ করেছি। এ কথাও বলেছি যে, রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব যে সব পদে রয়েছে তাও একইভাবে নারীর জন্য নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য যত চাকুরী আছে, সেগুলোর জন্য যোগ্যতায়ও তার কমতি নেই এবং ইসলামেও নিষিদ্ধ নয়। তবে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে তার সামঞ্জস্য ও সংগতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রী হিসাবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, চাকুরীটা কোন ক্রমেই এমন হতে পারবেনা। তাছাড়া চাকুরীরত মহিলা তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা এবং শরীরের নিষিদ্ধ স্থানগুলো তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবেনা। একই কক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে কাজ করতে পারবেনা। কেননা ভিন্ন পুরুষের সাথে নিভৃত সাক্ষাত শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একই কক্ষে কাজ করলে সেই নিষিদ্ধ নিভৃত সাক্ষাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এতো গেল শরিয়ত সংক্রান্ত দিক। সামাজিক দিক দিয়ে দেখলে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে নারীদের নিয়োগ স্বভাবতই পুরুষদের বেকারত্ব বাড়ায়। আমরা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি যে, একদিকে বিভিন্ন চাকুরীতে নারীদের ভিড় লেগে আছে, অপরদিকে উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দিবারাত চায়ের ষ্টলে আড্ডা দিয়ে চলেছে। পুরুষদের বেকার রেখে মহিলাদের চাকুরী দেয়ার কোন যুক্তি ও উপকারিতা থাকতে পারেনা। দক্ষ পুরুষের যদি এত অভাব থাকতো যে, খালি পদগুলো পুরুষ দিয়ে পূরণ করাই সম্ভব নয়, তাহলে ঐ সব পদ মহিলাদের দ্বারা পূরণ করা যুক্তিযুক্ত হতো। নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মস্থল থেকে বের করে সরকারী অফিস আদালতে পাঠানো আর যুবকদেরকে তাদের স্বাভাবিক কর্মস্থল অফিস থেকে দূর করে দিয়ে ঘরে, রাস্তায়, কিংবা চায়ের দোকানের আড্ডায় পাঠানো সমাজকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া এবং জাতিকে নৈরাজ্য ও সংকটের কবলে নিক্ষেপ করার শামিল।

লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় পুরোপুরি মহিলা কর্মচারীদের দখলে। আপনি সেই সব প্রতিষ্ঠানে অফিসের সময় শেষে দরজার কাছে দাঁড়ালে মহিলা কর্মচারীদের দলে দলে বেরুবার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারবেননা।

অথচ এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, চাকুরীরত একজন নারী একই কাজে নিয়োজিত একজন পুরুষের অর্ধেক কাজও করতে পারেনা। সম্প্রতি মিশরের সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান এ তথ্য উদঘাটন করেছেন। এও প্রমাণিত হয়েছে , একজন মহিলা কর্মচারী আর একজন মহিলা কর্মচারীর সাথে মিলিত হলে তারা এমন খোশগল্পে মত্ত হয়ে প্রচুর

www.amarboi.org

সময় কাটিয়ে দেয়, যার সাথে তাদের কাজের এবং দেশের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াদির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। এ কারণে সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মহিলা নিয়োগ করা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এক সময় তারা এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিল। কেননা পুরুষরা যে অধিক উৎপাদনে সক্ষম, তার অকাট্য প্রমাণ তারা পেয়েছে। মহিলা কর্মচারীদের ব্যাপক হারে নিয়োগ করে সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া তাদের কোন লাভ হয়নি।

এই সাথে এ বিষয়টাও যোগ করা ভুল হবেনা যে, একই কক্ষে একত্রে কর্মরত পুরুষ কর্মচারী ও মহিলা কর্মচারীর মধ্যে সময়ে সময়ে হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি পুরুষটির বিবাহিত ও একাধিক সন্তানের জনক হওয়াতেও তা বাধাগ্রস্ত হয়না। এ ধরনের ঘটনার নজীর পত্রপত্রিকায় ভুরি ভুরি রয়েছে। এই শেষোক্ত বিষয়টি মিলিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করা যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অফিস আদালতে মহিলাদের চাকুরির সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের চোখে প্রগতিবাদী সেজে তাদেরকে খুশী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। আসলে এটা অতিমাত্রায় সরলতা ও পাশ্চাত্যমুখী মানসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি জাতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্মান ও মর্যাদা লাভ কোন ভাবেই অফিস আদালতের চাকুরী থেকে পুরুষদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তদস্থলে নারীদেরকে নিয়োগ করার ওপর নির্ভশীল নয়। ওটা নির্ভর করে শুধু ঐ জাতির বুদ্ধি ও মেধার ভিন্নতার, কর্মক্ষমতা ও কর্মমুখিতা, উচ্চাভিলাস এবং শক্তিমত্তার ওপর। দেশের তাবত অফিস আদালতে মহিলাদেরকে চাকুরী দিলেই এই সব জিনিস অর্জিত হয়ে যাবে কি?

হ্যা, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যা মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে, যেমন হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড, নারীরাই অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারে। এ কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে অনুরোধ করবো, মেয়েদের চাকুরির সুযোগ পাইকারিভাবে উন্মুক্ত করবেন না, বরং যে সব কাজে হয় নারীরা ছাড়া কেউ সফলই হয়না, অথবা পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিকতর সফল হয়, সেই সব কাজে উন্মুক্ত করুন। এটা একটা বিশাল কর্মক্ষেত্র, যেখানে মহিলাদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি।

কর্মের অধিকার

ইসলামের বিধিবিধান জানে এমন কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেনা যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা যে সব চুক্তি ও কর্ম সম্পাদন করে, তা শুদ্ধ ও কার্যকর এবং এগুলো কোন অভিভাবক বা স্বামীর অনুমিত সাপেক্ষে নয়। আমরা এ বিষয়টি শুরুতেই পরিস্কার করে বলে এসেছি।

www.amarboi.org

এ বিষয়টিও বিতর্কের উর্দ্ধে যে, নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্বসম্পন্ন স্বামী বা কোন আত্মীয় না থাকলে এবং সরকারী কোষাগারও তার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে তার পক্ষে নিজের ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জন্য শরীয়তসম্মত যে কোন কাজ করা বৈধ।

এমনকি যে পিতা মেয়ের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার ভরণ পোষণের জন্য দায়ী, তিনিও যদি এই মর্মে রাযী হন যে, সে অর্থোপার্জনের জন্য দর্জিগিরি বা অনুরূপ কোন শ্রমের কাজ করতে পারে, তবে তার ভরণপোষণের দায় থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন এবং ঐ মেয়ে নিজেই নিজের জন্য দায়ী হবে।

আল্লামা ইবনু আবিদীন দোররে মুখতারের ব্যাখ্যা 'রদ্দুল মুহতার' দ্বিতীয় খণ্ড ৫৭১ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"আল খায়রুর রামালী বলেছেনঃ নারী যদি দর্জিগিরি বা অনুরূপ কোন পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়, তাহলে সে তার উপার্জন থেকেই নিজের ভরণপোষণ চালাবে-এটাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা বলবোনা যে, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার পিতার ওপর বর্তাবে। তবে তার উপার্জন যদি এ ব্যাপারে যথেষ্ট না হয়, তবে যতটুকু কমতি থাকে ততটুকু দেয়া পিতার কর্তব্য। অবশ্য কন্যাকে কারো চাকুরীতে সোপর্দ করা বৈধ নয়। কেননা ঐ চাকুরীর মালিক তার সাথে নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ পেতে পারে, যা শরিয়তে বৈধ নয়। কিন্তু তার জানা কোন শিল্পকর্ম দ্বারা তাকে কিছু উপার্জন করতে পিতা বাধ্য করতে পারবে। আর তাকে কোন শিল্পকর্ম যথা দর্জিগিরি, নকশা করা ইত্যাদি শেখার জন্য কোন মহিলা শিক্ষিকার কাছে সোপর্দ করাও বৈধ।

কাজেই অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা যে মহিলাকে বাড়ীর বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করে, তার সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছিনা। কেননা ইসলামী পর্দার বিধান মেনে চলার শর্তে এটা সম্পূর্ণ বৈধ। অর্থাৎ কোন পর পুরুষের সাথে নিভৃতে সাক্ষাত করবেনা, কোন পুরুষের সামনে তার শরীরের আকর্ষণীয় ও গোপনীয় অংশ উন্মুক্ত করবেনা, এবং মিষ্টি কথা ও সন্দেহজনক চালচলন দ্বারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবেনা, এই শর্তে সে বাড়ীর বাইরে গিয়ে অর্থোপার্জন করতে পারবে।

যে নারীকে ভরণপোষণ ও অর্থোপার্জনের কষ্ট ও গঞ্জনা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব কারোর ওপর অর্পিত আছে, সেই নারীর অর্থোপার্জনের জন্য বাড়ী ও সন্তানাদি রেখে যত্রতত্র অবাধে বিচরণ ও অবস্থান নিয়েই আমাদের এ আলোচনা কেন্দ্রীভূত। এ বিষয়ে দুটো চিন্তাধারা রয়েছে এবং সমাজের ওপর এই দুই চিন্তাধারারই সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ ইসলামী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার মূলকথা হলো, সাধারণভাবে নারীকে তার নিজের ভরণপোষণের জন্য দায়ী করা ঠিক নয়। বরং তার পিতা, স্বামী অথবা ভাই প্রমুখের ওপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত থাকা উচিত, যাতে সে তার দাম্পত্য জীবনে অথবা মাতৃত্বে নিজের স্বাভাবিক ভূমিকা সচ্ছন্দে পালন করতে পারে। নারীর

www.amarboi.org

পারিবারিক দায়িত্ব পালন, সন্তান লালন, পুরুষদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে তাকে নিরাপদ রাখা এবং সমাজে তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এই চিন্তাধারা খুবই সহায়ক ও কার্যকর।

দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারা অনুসারে, মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট বয়সে, সাধারণত সতেরো বছরে উপনীত হওয়ার পর তার পিতা বা অন্যান্য আত্মীয়ের ওপর তার ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব থাকেনা। বরং নিজের জীবন যাপন এবং ভবিষ্যত স্বামীকে সহায়তা করার জন্য এই বয়সেই তাকে কাজের খোঁজে নেমে পড়তে হবে। বিয়ের পরেও তাকে তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের পেছনে অর্থ ব্যয়ে অংশ নিতে হবে। যখন সে বৃদ্ধা হয়ে যাবে তখনো কর্মক্ষমতা থাকলে নিজের ভরণপোষণের জন্য তাকে কাজ করে যেতে হবে, তা সে তার ছেলে যত বড় ধনকুবেরই হোক না কেন।

এ চিন্তাধারার ফল সুস্পষ্ট এবং আমি তা পাশ্চাত্যে স্বচক্ষেই দেখেছি, পাশ্চাত্যের লেখকদের লেখায় পড়েছি এবং সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের অনেক নারীর আর্ত চিৎকারেও তা শোনা যাচ্ছে।

এই পাশ্চাত্য দর্শনের সবচেয়ে মারাত্মক কুফল এইযে, এতে নারীর প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষিত হয়নি, বরং নারীকে শুধু পুরুষের যৌন লালসা চরিতার্থ করার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে, যার বিনিময়ে সে উন্নত জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারে। তাছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের যে কষ্টকর প্রাকৃতিক দায়িত্ব নারীর ওপর অর্পিত রয়েছে, তার ওপর তাকে নিজের জীবিকা উপার্জনের বাড়তি প্রাণান্তকর দায়িত্বও অর্পণ করেছে। এই দায়িত্ব চাপানোর ফলে পরিবারের খণ্ড বিখণ্ড হওয়া ও পিতামাতার তদারকীর আওতার বাইরে সন্তানদের বিকাশ বৃদ্ধি স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ সমর্থক একটি শ্রেণী নারীর জন্য পুরুষের সমপর্যায়ের চাকুরীর সুযোগ উন্মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছে। তারা এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত আছে যে, এই ব্যবস্থা ছাড়া নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করার আর কোন উপায় নেই। তারা এরূপ ধারণাও পোষণ করে যে, পাশ্চাত্য নারীর জীবন সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে এবং তাদের সমান সমান দায়িত্ব বহন করে বলেই তারা এত উন্নত।

জনৈকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী একবার এই বিষয়ে আমার সাথে মত বিনিময় করছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে টাইপিষ্ট হিসাবে চাকুরি করতো। অথচ তার চাকুরির কোন প্রয়োজন ছিলনা। সে বললো, আমিও যে একজন মানুষ, সেটা উপলব্ধি করার জন্যই আমি চাকুরি করি। আমি তাকে বললাম, চাকুরি করা বা না করার সাথে কোন মানুষের নিজের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এমন লোকের অভাব নেই, যারা চাকুরি করেও নিজকে মানুষ বলে উপলব্ধি করেনা। আবার অনেকে নিজ হাতে কোন খাটুনির কাজ করেনা কিন্তু মানসিক ও চিন্তাগত

www.amarboi.org

তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে অন্যদের চেয়েও অধিক অনুভূতির পরিচয় দিয়ে থাকে।

আমি তাকে সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীর উদাহরণ দিলাম। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই দুই শ্রেণীর লোকের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যবসা বা অন্য কোন কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারা যাতে স্বহস্তে কাজ করার চেয়ে সমাজের জন্য অধিকতর উপকারী সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকতে পারে। সেজন্যই এই নিষেধাজ্ঞার রেওয়াজ রয়েছে। এটাকে কি তাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা বা অবমূল্যায়ন গণ্য করা হবে? রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের নিম্নতম স্তরের একজন সরকারী কর্মচারী কি নিজেকে মনুষ্যত্বহীন ভাবে আর এই জন্যই কি সে তার কক্ষে কেবল তার সামনে রক্ষিত কিছু কাগজপত্র পড়ে ও তাতে সাক্ষর করে?

ছাত্রীটি বললো ঃ আমি আমার পিতার ওপর বোঝা হয়ে থাকতে চাইনা। নিজে পরিশ্রম করে নিজের ভরণ পোষণ চালাতে চাই।

আমি তাকে বললাম ঃ যে সামরিক বা বেসামরিক কর্মচারী প্রতি মাসের শুরুতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণ করে, সে নিজেকে রাষ্ট্রের বোঝা মনে করেনা। বরং তারা পরিপূর্ণ আত্মসম্মানবোধ সহকারেই বেতন নিয়ে থাকে। কেননা তারা একটা মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। তুমি যখন বিয়ের আগে তোমার পিতামাতার বাড়ীতে থেকে টুকটাক কাজ করে তাদেরকে সাহায্য কর এবং বিয়ের পরে তোমার নিজের সংসারের যাবতীয় কাজের দেখাশুনা কর, তখন এ সব কিছুতেই তুমি একটা মহান সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাক। তুমি একটি বিদ্যালয়ে থেকে পিতামাতার ন্যায় দু'জন হৃদয়বান শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাক। আর যে মেয়ে একমনে লেখাপড়া করে, সে পিতামাতার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করতে লজ্জাবোধ করবে কোন কারণে? এরপর তুমি যখন বিয়ে করবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই তোমার নানা ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। এ ব্যস্ততায় তোমার পুরো সময়ই ব্যয়িত হবে। এমতাবস্থায় তুমি কি তোমার স্বামীর ওপর বোঝা হবে? বরঞ্চ এ সময় তোমার যে ব্যস্ততা থাকবে, তা হয়তো তোমার স্বামীর গৃহবহির্ভূত ব্যস্ততার চেয়েও বেশী। এ সময় তুমি কি বাইরে একটা কাজ করার জন্য সংসারের এই সব ব্যস্ততা ছেড়ে দেবে? না উভয় ব্যস্ততা এক সাথে চালিয়ে যাবে? বাড়ীর বাইরে কিছু করার জন্য তুমি যদি বাড়ীর ভেতরের ব্যস্ততা পরিহার কর, তবে সেটা হবে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের বরখেলাপ এবং আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আর ভেতর ও বাইরের উভয়টা এক সাথে সামাল দিতে গেলে শরীরের ওপর এমন চাপ পড়বে যা তুমি বরদাশত করতে পারবেনা এবং সক্ষমও হবেনা। সেটা হবে তোমার নিজের ওপর নিকৃষ্টতম অত্যাচার। ইসলাম যখন তোমার কাছ থেকে

www.amarboi.org

একনিষ্ঠভাবে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে চায় এবং তোমার স্বামী বা পিতার ওপর তোমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করে, তখন সে তোমাকে অবমাননা ও অবজ্ঞার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তোমাকে কষ্টকর দ্বিগুণ ব্যস্ততা থেকে নিষ্কৃতি দেয়। তোমার প্রতি ইসলামের এই মহানুভবতা কি তোমার দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা বলে বিবেচিত হবে?

আমার মতে নারীদের কর্মজীবী হওয়ার মাত্রাতিরিক্ত বাসনা নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এই পথ অবলম্বন করার পর নারীকে সেই সব কষ্টকর দায়দায়িত্ব বহন করতেই হবে, যা পাশ্চাত্যের নারীকে করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনের সকল অনিবার্য কুফলগুলোও তাকে ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই নিজের জীবন যাপন ও লেখাপড়ার ব্যয়ভার তাকে পনেরো বা ষোল বছর বয়স থেকেই বহন করতে হবে। আর নিজের পছন্দের ভাবি স্বামীকে খুশী করার জন্য চাকুরী করে অর্থ সঞ্চয়ও তাকে করতে হবে। আর তারপর তার নিজের ও পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতে স্বামীর সাথে সাথে তাকেও অর্থযোগান দিতে হবে। শুধু তাই নয়, যদি ষাট বছর বয়স হওয়ার পর তার ভার বহনের জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান থেকে থাকে, তা হলে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাকে চাকুরি চালিয়ে যেতে হবে। নচেত মৃত্যু পর্যন্তই তা অব্যাহত রাখতে হবে। পিতা বা ভাই এর কাছে কোন সাহায্য সে চাইতে পারবেনা। তাকে যেভাবেই হোক এবং যেখানেই হোক, একটা চাকুরি খুঁজতেই হবে, চাই তা কোন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হোক, কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হোক, কোন বৃহৎ আড়তে সেল্‌সম্যান বা হিসাব রক্ষক হিসাবে হোক, পত্রিকা বিক্রেতা হিসাবে হোক, রাস্তার ঝাড়ুদার হিসাবে হোক, জুতো পালিশকারী হিসাবে হোক, আবর্জনা নিষ্কাশক হিসাবে হোক, রেল বা বাসে টিকেট বিক্রেতা হিসেবে হোক, ষ্টেশন পরিষ্কারীনী হিসাবে হোক, পায়খানা পরিষ্কারীনী হিসাবে হোক, রাতের শেষভাগে বৃহৎ ভবনসমূহের পাহারাদার হিসাবে হোক, ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসাবে হোক, মুটি মজুর হিসাবে হোক, কিংবা পুরুষদের করণীয় অন্য যে কোন কাজেই হোকনা কেন। ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র আমি নারীকে এ সব কাজ করতে দেখেছি। আমাদের সমাজে এখন যদিও কর্মজীবী মহিলারা সহজ কাজই করছে, কিন্তু সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন তাকে পাশ্চাত্যের নারীর মত কঠিন কাজগুলোও করতে হবে। কেননা এই প্রক্রিয়া একদিন সেই পর্যায়েও নিয়ে যাবে। বিশেষত দাবী যখন নারী পুরুষের সম অধিকারের তখন কোন্ অজুহাতে কঠিন কাজগুলো শুধু পুরুষের জন্য থাকবে, এবং নারীরা কেবল আরামদায়ক কাজ করে যাবে? সেটা কি আবার বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা?

নারীর কর্মজীবী হওয়ার ফলে পরিবারে ভাঙ্গন

সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার এইযে, নারীর সামনে বাড়ীর বাইরে চাকুরী করার সুযোগ উন্মুক্ত করার পর সর্ব প্রথম সে দাম্ভিকতায় মেতে উঠবে। কারণ বাড়ীর ভেতরের চেয়ে

www.amarboi.org

বাইরে সে অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করবে। এরপর ক্রমশ সে এমন সব কাজে জড়িত হয়ে পড়তে বাধ্য হবে, যার সম্পর্কে কারো কাছে কোন অভিযোগ করতে সক্ষম হবেনা। আর সর্বশেষ বিষময় ফল দাঁড়াবে পরিবারের ভাংগন ও ছেলেমেয়েদের দূরে ছিটকে পড়া। এটা হলো সমাজের ধ্বংসের সবচেয়ে মারাত্মক উপকরণ।

পাশ্চাত্যবাসীর অনুশোচনা

একথা কখনো ভাববেন না যে নারীর চাকুরীজীবি হওয়ার পর পাশ্চাত্যে নারীর ও পরিবারের যে অবস্থা হয়েছে, তাতে পাশ্চাত্যবাসী সন্তুষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনুতাপ ও অনুশোচনা করা শুরু করেছে। তারা এই বিষময় ফল সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে বলেও মন্তব্য করতে আরম্ভ করেছে। এখানে আমি তাদের এ জাতীয় কিছু কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আগস্ট কাউন্ট, যিনি আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলে বিবেচিত হন, স্বীয় 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"নারীদের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাদের পক্ষে সংগ্রামের দাবীদার পুরুষরা নারীদের জন্য যে বস্তুগত সম অধিকারের দাবী জানায়, সেই সমঅধিকার যদি নারীরা কখনো পায়, তাহলে তাদের নৈতিক অবস্থার বিপর্যয়ের আনুপাতিক হারেই তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে তারা বেশীর ভাগ আচরণে কঠোর নৈতিক প্রতিরোধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে।কিন্তু সেটা তারা করতে সক্ষম হবেনা। অথচ এতে তাদের বিকল্প ভালোবাসার উৎসগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাবে"।

বিশিষ্ট নারী অধিকার সংগ্রামী মাদার হেরেফোর বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক ক্রুদান এর কাছে যখন নারীদের সম্পর্কে তার মতামত জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন যে, "নারীদের পরিচালিত এই সংগ্রাম তাদের নারীত্বের দুর্বলতারই লক্ষণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের শক্তির মূল্যায়ন এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানে অক্ষম।" এ বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক যুক্তিপ্রমাণ দেয়ার পর তিনি বলেন।

"সামাজিক অবকাঠামোতে নারীর অবস্থান যদি অবিকল পুরুষের মত হয়, যেটা তোমার কাংখিত, তাহলে নারী গোল্লায় যাবে। সে তখন দাসী বাঁদীতে পরিণত হবে।"

অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক 'জাওল সিমন' বলেন ঃ

"নারীরা এখন কাপড় কেনে, টাইপ করে, আরো কত কী! সরকার তাদেরকে কলকারখানায়ও নিয়োগ করেছে। এভাবে তারা সামান্য ক'টা পয়সা আয় করতে পারছে বটে। কিন্তু তারা এর বিনিময়ে তাদের পরিবারের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। এ কথা ঠিক যে, স্বামীরা স্ত্রীদের উপার্জন দ্বারা বেশ লাভবান হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং স্বামীর উপার্জন কমে গেছে। কেননা স্ত্রী তার উপার্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে"।

তিনি আরো বলেন –

www.amarboi.org

"এদের চেয়েও উন্নত এক শ্রেণীর নারী আছে, যারা অফিস আদালতে, দোকানপাট, সরকারী শিক্ষা, ডাক ও তার, রেলওয়ে ও ব্যাংক ইত্যাদিতে চাকুরি করে। কিন্তু এসব চাকুরি তাদেরকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।"

আগষ্ট কাউন্ট তার পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে বলেন, "স্ত্রীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।

আমাদের মানব জাতির জন্য এটাই স্বাভাবিক আইন। নারী জাতির জন্য এটাই আসল পারিবারিক জীবনের নিশ্চয়তাদানকারী আইন। এই বাধ্যবাধকতা (অর্থাৎ স্বামীর ওপর স্ত্রীর খাদ্য যোগানোর বাধ্যবাধকতা) মেহনতী জনগণের ওপর চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর খাদ্য যোগানোর বাধ্যবাধকতার মতই, যাতে করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাদের মূল দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণ একাগ্রতা সহকারে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে পুরুষ জাতির ওপর স্ত্রী জাতির খাদ্য যোগানোর দায়িত্বটা অনেক বেশী পবিত্র ও মূল্যবান। কেননা নারী জাতির দায় দায়িত্ব পালনের জন্য পারিবারিক জীবনের আবশ্যকতা অত্যধিক। কিন্তু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্বটা কেবল সামাজিক সংহতিমূলক, পক্ষান্তরে নারীদের প্রতি পুরুষদের এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।"

আগষ্ট কাউন্ট আরো বলেন ঃ

"যখন (নারীর) কোন স্বামী বা আত্মীয়স্বজন থাকেনা, তখন সমাজের উচিত প্রত্যেক নারীর জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এর কারণ দুটো ঃ প্রথমতঃ তার স্বাধীনতা না থাকা, যা তার জন্য অনিবার্য। দ্বিতীয়তঃ তার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা। এ প্রসংগে তোমাকে মানব উন্নয়নের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। সঠিক অর্থে মানব উন্নয়ন করতে হলে নারী জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া জীবন হওয়া জরুরী এবং নারীকে ঘরের বাইরের সমস্ত কাজ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে, যাতে করে তার প্রধান দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়।"

মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশিষ্ট গবেষক জিওম ফ্রিবরো বলেন ঃ

"ইউরোপে এমন বহু মহিলা রয়েছে, যারা পুরুষসুলভ কাজকর্ম করে থাকে এবং এদ্বারা তারা মহিলাদের বিয়ে বন্ধ করার দাবী জানায়। এসব মহিলাকে 'তৃতীয় লিংগ' নাম দিলেও ভুল হবেনা। কেননা তারা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়।"

অতঃপর তিনি বলেনঃ "প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে এ জাতীয় তৎপরতার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সমাজবিদগণ সচেতন হতে শুরু করেছেন। কেননা এ সব মহিলা পুরুষদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সমাজের বোঝা হয়ে পড়েছে এবং এখন তারা কাজ পায়না। এ অবস্থা চলতে থাকলে এ থেকে গুরুতর সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে।"

জৌল সিমসন বলেন ঃ

"নারীকে নারী থাকতেই হবে। কেননা তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেই সে নিজেও সুখী হতে পারে এবং অন্যদেরকেও সুখী বানাতে পারে। তাই আমাদের নারীদের সংস্কার

www.amarboi.org

ও সংশোধনের কাজ করে যেতে হবে, কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে পুরুষে রূপান্তরিত করা থেকে সাবধান হতে হবে। কেননা এ দ্বারা নারীরা অনেক কল্যাণ থেকে আর আমরা সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। কেননা প্রকৃতি যা কিছুই বানিয়েছে, অত্যন্ত শক্ত ও অটুট ভিত্তির ওপর বানিয়েছে। তাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করে যেতে হবে। প্রকৃতির নিয়মকানুন লংঘিত হয়. এমন যাবতীয় তৎপরতা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।"

প্রখ্যাত লেখিকা এ্যানি রোর্ড ১০ই মে, ১৯০১ সালে প্রকাশিত ইষ্টার্ণ মেইলের এক নিবন্ধে বলেন ঃ

"আমাদের মেয়েদের বাড়ীতে ঝি হিসেবে অথবা ঝি চাকরানীর মত কাজ করা কলকারখানায় কাজ করার চেয়ে ঢের বেশী কল্যাণকর ও কম বিপজ্জনক। কেননা কলে কারখানায় মেয়েরা এত বেশী নোংরা হয়ে যায় যে, চিরদিনের জন্য তাদের জীবনের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়। হায়, আমাদের দেশগুলো যদি মুসলিম দেশগুলোর মত হতো! সে সব দেশে নারীর সুনাম আছে, সতীত্ব আছে, পবিত্রতা আছে। সেখানে নিকৃষ্ট দাসদাসীরাও পরম তৃপ্তির জীবন যাপন করে। এবং বাড়ীর ছেলে মেয়েদের মত সমান আচরণ পেয়ে থাকে। তাদের সম্ভ্রমের কেউ ক্ষতি করেনা। ইংরেজ শাসনাধীন দেশগুলোর জন্য এটা চরম কলংকজনক ব্যাপার যে, তারা তাদের মেয়েদেরকে পুরুষদে সাথে মাত্রাতিরিক্ত মেলামেশা ও ঢলাঢলি করতে দিয়ে তাদেরকে অসতী নারীর নমুনা বানিয়ে ছেড়েছে। আজ নারীর সম্মান রক্ষার খাতিরে আমাদের এমন কিছু করতেই হবে, যাতে তাদেরকে তাদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল ঘরোয়া জীবন যাপনে ও পুরুষ সুলভ কাজ পুরুষদের জন্য রেখে দিতে বাধ্য করা যায়।"

জৌল সিমসন বলেন ঃ

"যে নারী বাড়ীর বাইরে কাজ করে, সে একজন নগণ্য শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করে বটে। তবে একজন নারীর দায়িত্ব পালন করেনা।"

এ উদ্বৃতিগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা প্রতিফলিত করে। এ সময় পাশ্চাত্যের মেয়েদের অতিমাত্রায় গৃহবহির্ভূত কাজ করতে আরম্ভ করায় পরিবারগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে।

এ প্রসংগে এ কথা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে যে, হিটলার ও মুসোলিনী তাদের শাসনকালের শেষের দিকে বাড়ীর বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরোয়া জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী নারীদেরকে পুরস্কৃত করা শুরু করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এই অভিযোগ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, তাদের দেশগুলো পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তারা এ সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছেন এবং প্রায় সবাই একমত হয়েছেন যে, নারীর বাড়ী ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যাওয়া ছাড়া পরিবার টুকরো টুকরো হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

www.amarboi.org

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন ঃ

"নারীদেরকে সরকারী কাজে নিয়োগ করার কারণে পরিবার ধ্বংস হতে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেই শাশ্বত ও ঐতিহ্যগত নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোন একজন মাত্র পুরুষের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চায়না।"

১৯৫৬ সালে আমার লণ্ডনে থাকাকালে জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কী?"

আমি জবাব দিলাম ঃ "আমরা এর খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্জন ও ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করি।"

তিনি বললেন ঃ "এটা অসম্ভব। কেননা সভ্যতা অবিভাজ্য। আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইউরোপে নারী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। কেনন্যা নারী কলকারখানায় কাজ করতে চলে গেছে। এটা অনিবার্য ছিল। অথচ এটাই পরিবার ভাঙ্গার কারণ"।

আমি বললাম ঃ "আমার মতে, আপনাদের সমাজে পরিবারে ভাংগনের কারণ শিল্প বিপ্লব নয়, বরং নারীকে গৃহ থেকে বের করাই এর কারণ। আপনারা পাশ্চাত্যবাসী দুটো কারণে তাদেরকে গৃহ থেকে বের করেছেন ঃ প্রথমতঃ প্রবৃত্তির তাড়নায় আপনারা নারীকে সদাসর্বদা ও সর্বত্র নিজেদের পাশে দেখতে চেয়েছিলেন। ট্রামে, রাস্তাঘাটে, দোকানে, অফিস আদালতে ও হোটেল রেস্তোরাঁয় কোথাও নারীর অনুপস্থিতি আপনারা মেনে নিতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ অতিমাত্রায় অর্থনৈতিক স্বার্থপরতা। মেয়ে হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, কিংবা মা হিসাবে নারীর ব্যয়ভার আপনারা বহন করতে চাননা। এভাবে তাদেরকে নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছেন। কাজেই তারা বাড়ীর বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এভাবেই আপনাদের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।"

ইংরেজ অধ্যাপক বললেন ঃ এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনারা কী করবেন?

আমি বললাম ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান বিয়ে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেয়ের ভরণ পোষণের ভার পিতার ওপর অর্পণ করে। মেয়ের বিয়ের পর তার ও তার সন্তানদের ব্যয়ভার ন্যস্ত হয় একমাত্র তার স্বামীর ওপর। স্বামী যদি মারা যায় এবং তার কোন সহায় সম্পদ না থাকে, তাহলে তার ভরণ পোষণের ভার অর্পিত হবে তার পিতার ওপর। মোটকথা, জীবনের কোন সময়েই সে নিজের খাদ্য লাভ, জীবন ধারণের জন্য চাকুরী করার প্রয়োজন বোধ করবে না।

তিনি অবাক হয়ে বললেন ঃ আমরা পাশ্চাত্যবাসী এত স্বার্থ ত্যাগ করতে অক্ষম।

আমার মনে পড়ে, যখন লণ্ডনের ডোভার বন্দর থেকে জাহাজ যোগে এক শিক্ষা সফরে বেলজিয়ামের ওস্টন বন্দরে যাচ্ছিলাম, তখন জাহাজের ভেতর এক ইটালীয় তরুণীর সাথে আমার সাক্ষাত ও মতবিনিময় হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতা এই তরুণী আমার সাথে মুসলিম নারীর অবস্থা, তার জীবন ধারণ পদ্ধতি, ইসলামে নারীর অধিকার,

www.amarboi.org

এবং নারীকে জীবন ধারণের জন্য উপার্জনের কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলাম যে সম্মান দেখিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করছিল। ইসলাম যে তাকে স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে ও গৃহিনী হিসাবে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দানের জন্যই তাকে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, সেটাও সে তুলে ধরছিল। আমি যখন এ বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি পেশ করলাম এবং ইসলামে ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর অবস্থার তুলনা করলাম, তখন ঐ তরুণী অত্যন্ত সরলভাবে ও খোলামেলা বললো ঃ মুসলিম নারীর প্রতি আমার সত্যই ঈর্ষা হয় এবং আমার আক্ষেপ হয় যে, আপনাদের দেশে আমার জন্ম হলোনা কেন। আমি এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তাকে বললাম ঃ তুমি কি পাশ্চাত্যের নারীদেরকে পুনরায় গৃহমুখী হবার এবং পুরুষদেরকে নারীর প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবার আবেদন জানানোর উদ্যোগ নেবে?

সে বললঃ "এখন আর সে সুযোগ নেই। সময় পার হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের নারী যখন গৃহ থেকে বাইরে যেতে ও সমাজের সাথে অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তখন তার জন্য ঘরোয়া জীবনে পুনঃ অভ্যস্ত হওয়া কঠিন হবে– যদিও আমার বিশ্বাস যে, এতে সে এত সুখশান্তি লাভ করতে পারে, যা আর কোনভাবে পারেনা।"

বাস্তব ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্য সমাজে নারীর গৃহ পরিত্যাগ ও বাড়ীর বাইরে কাজ করার দরুন এত অশান্তি ধূমায়িত হয়ে উঠেছে যে, অনেকেই এখন এ ব্যাপারে অভিযোগে সোচ্চার। এমনকি এ কারণে তাদের ঐ সব দেশে এমন এক বখাটে ও নৈরাজ্যবাদী নব্য প্রজন্মের উদ্ভব হয়েছে, যাদের বৈশিষ্ট্য হলো লম্বা চুল রেখে লম্বা দাড়ী রেখে এবং কিম্ভূৎকিমাকার পোশাক পরে পথে ঘাটে অশালীন ও উচ্ছৃংখল আচরণ করে বেড়ানো, সমাজের শান্তি নষ্ট করা, যাকে তাকে উত্যক্ত করা এবং দোকানপাট ও হোটেল রেস্তোঁরা ভাংচুর, ও লণ্ডভণ্ড করা। এ প্রজন্মকে নিয়ে এখন নিরাপত্তা বাহিনী তটস্থ, সমাজতাত্ত্বিকরা উদ্বিগ্ন এবং শিক্ষাবিদরা গবেষণারত। তাদের সবাই একটি বিষয়ে একমত। আর সেটা এইযে, এই বাউণ্ডেলে প্রজন্মটির উদ্ভবের একমাত্র কারণ গৃহগুলো নারীশূন্য থাকা।

পাশ্চাত্যের কিছু কিছু মহিলা স্বামী কিংবা রাষ্ট্রের ওপর তাদের নিজেদের ও সন্তানদের জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ভার অর্পন সাপেক্ষে সন্তানদের লালন পালনে একাগ্রভাবে মনোনিবেশের লক্ষ্যে নারীদের গৃহে ফেরার আবেদন জানাতে শুরু করেছে।

মিউনিক থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে বহুল প্রচারিত জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জার্মান উইক' ২৯শে মে, ১৯৫৯ তারিখে জনৈকা জার্মান মহিলার একটি চিঠি ছেপেছিল। মহিলা তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ভার মেটানোর জন্য পুরুষের উপার্জন যথেষ্ট নয় বলেই নারীরা বাধ্য হয়ে চাকুরি করে। আর চাকুরি করার প্রয়োজনে সন্তানকে সকাল বেলা অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়, যাতে কর্মক্ষেত্রে যেতে অসুবিধা না হয়। আমিও সন্তানকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেই প্রতিদিন কর্মস্থলে যাই। আমার, বড়ই ইচ্ছা হয় ঘরে বসে

www.amarboi.org

থাকতে কিন্তু বর্তমান জার্মান অর্থনীতি সকল শ্রেণীর নাগরিকদের ভরণ পোষণের নিশ্চয়তা দেয়না, তাই নারীর ঘরে ফেরা আপাতত অসম্ভব এবং এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

প্রাচ্যের যারাই, বিশেষতঃ যে সব মুসলমান পাশ্চাত্য সফর করেছে, তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, সেখানকার নারীদের অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি চারবার ইউরোপ সফর করেছি। কিন্তু সেখানকার নারীদের দুর্গতি দেখে যত মর্মপীড়া অনুভব করেছি, ততটা আর কোন কিছু দেখে অনুভব করিনি। কেউবা শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আবার কেউবা পুরোপুরি পুরুষের সমপর্যায়ে উন্নীত হবার মানসে নিজেদের এই দুর্গতি ডেকে এনেছে।

এ ক্ষেত্রে নারীর স্বভাবসুলভ সুযোগ গ্রহণে পাশ্চাত্যের পুরুষ পুরো সফলতা লাভ করেছে। তারা নিজেদের আর্থিক মুনাফা লাভ ও যৌন লালসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে নারীকে চরমভাবে পরাভূত করেছে। এ সব কিছু দেখার পর আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে, আজকের মুসলিম নারীদের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, তারা পাশ্চাত্যের নারীর তুলনায় অধিকতর সম্মানিত ও অধিকতর সুখশান্তির অধিকারী।

এই সাথে আরো একটা কথা না বলে পারছিনা। পাশ্চাত্য নারীদের যে জৌলুসপূর্ণ দৃশ্য সিনেমায়, টেলিভিশনে, সচিত্র পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় তা দেখে প্রতারিত হওয়া নিতান্তই বোকামী। কেননা বাস্তবে এ ধরনের বিলাসী ও জৌলুসপূর্ণ জীবন সারা ইউরোপে মুষ্টিমেয় সংখ্যক নারীরই ভাগ্যে জোটে। এ ছাড়া কোটি কোটি সাধারণ মহিলা সেখানে এমন দুর্দশাপূর্ণ জীবন যাপন করে, যা দাসদাসীদের জীবনের সাথে তুলনীয়। আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, পাশ্চাত্যের নারীরা বাড়ীর বাইরে চাকুরি ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা ভোগ করছে, তা তাদেরকে এক নতুন ধরনের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। এটা এমন এক দাসত্ব, যার সাথে নারীরা অতীতের কোন সভ্যতার আমলেই পরিচিত হয়নি।

অধ্যাপক শফিক জেবরী স্বীয় পুস্তক 'আরদুস্ সিহ্র' (মায়াবী দেশ)-এ বলেন ঃ

"আমেরিকায় নারীরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের কাজে যোগদান করতে গিয়ে নিজেদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। এটা সমাজ জীবনের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিচ্ছে। একজন মহিলা একই সাথে দিনের বেলা বাড়ীর বাইরে চাকুরিও করবে, আবার ছেলেমেয়ে ও সংসারের তদারকীও করবে– এটা কিভাবে সম্ভব? মার্কিন নারী এ দিক দিয়ে এমন এক ঝঞ্ঝাটপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করেছে, যা পরিণামে তার সাথে তার স্বামীর অবনিবনা ঘটিয়ে দিতে পারে।"

সিরীয় নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী সালফা আল হাফফার আল-কাসবারী, যিনি বহুবার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করেছেন, মন্তব্য করেছেন ঃ

"পর্যটক সাহিত্যিক শফিক জাবরী আমেরিকায় লক্ষ্য করেছেন যে, শিশুদেরকে অতি অল্পবয়সেই খেলাধুলা ও গানবাজনায় মেতে থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং নারীদেরকে কলেকারখানায় পুরুষসুলভ বিভিন্ন কাজে, এমনকি রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত

www.amarboi.org

থাকতে দেখেছেন। এভাবে নারীর জীবন ও যৌবন তার নারীসুলভ স্বভাব প্রকৃতির সাথে বেমানান কাজে ব্যয়িত হতে দেখে তিনি সংগতভাবেই মর্মাহত হয়েছেন। অধ্যাপক শফিক জাবরীর উক্তিগুলো আমার ভালো লেগেছে। কেননা আমি প্রায় পাঁচ বছর আগে আমেরিকা থেকে ফিরেছি। সেই সময়ও পুরুষের সমান হওয়ার অন্ধ প্রতিযোগিতায় নারীর যে শোচনীয় দশা হতে দেখেছি, তাতে আমি মর্মাহত হয়েছি। জীবিকা উপার্জনের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পরিণামে সে শুধু পারিবারিক সুখশান্তিই হারায়নি, এমনকি যে স্বাধীনতার জন্য তারা যুগ যুগ কাল ধরে সংগ্রাম করেছে তাও হারিয়েছে। তারা যন্ত্রের দাসত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের প্রত্যাবর্তন এখন প্রায় অসম্ভব। এটা বড়ই দুঃখজনক যে, প্রকৃতি নারীকে যে সর্বাধিক মূল্যবান জিনিসটি দিয়েছে, সেটাই সে হারাতে বসেছে। সেই জিনিসটি হচ্ছে তার নারীত্ব। আর এটা হারিয়ে সে সমস্ত সুখ শান্তিও হারিয়েছে। একটানা ক্লান্তিকর কাজ তাকে তার পার্থিব বেহেশত থেকে বঞ্চিত করেছে। পরিবার হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বাভাবিক সুখের নীড়। মাতা ও গৃহিনীর তদারকী ছাড়া এই সুখের নীড় টিকে থাকতে পারেনা। পরিবারই সমাজের ও ব্যক্তির সুখের উৎস। পরিবারই কল্যাণ, মেধা ও প্রজ্ঞার সূতিকাগার।"

মোদ্দাকথা এইযে, আমাদেরকে দুটি দর্শনের মধ্য থেকে যে কোন একটা বেছে নিতে হবে। হয় বেছে নিতে হবে ইসলামের দর্শনকে, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উৎকৃষ্টতম রক্ষক, এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসাবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এ জন্য সে স্বামীর ওপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের ওপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণ পোষণের ভার অর্পণ করে। এতে তার অবমাননা বা অবমূল্যায়নের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা নারী মানব জাতির সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বটা পালন করে, যা মানব জাতির সুখশান্তি ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষাকবচ।

আর যদি ইসলামের দর্শন তার মনোপুত না হয় তাহলে দ্বিতীয় যে দর্শনটি তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তা হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার দেয়া জড়বাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এ দর্শন তার জৈবিক দাবীর ব্যাপারে তার ওপর কঠোর নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন চালায় এবং স্ত্রী ও মা হিসাবে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করতেও তাকে বাধ্য করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও নিরপেক্ষতা নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

আমরা যারা মুসলমান, তাদের পক্ষে তো ইসলামী দর্শন ও তার জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণের মনে করা সম্ভবই নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "ওরা কি তবে জাহেলিয়াতের বিধান চায়? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধান দাতা আর কে আছে?" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৫০)

www.amarboi.org

নরনারীর অবাধ মেলামেশা

এ পর্যায়ে নরনারীর মেলামেশা সংক্রান্ত শরীয়তের কতিপয় জরুরী বিধির উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করা এবং দু'হাতের তালু ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ পর্দায় আবৃত রাখার নির্দেশ দেয়। (মুখমণ্ডল খোলা সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের যুক্তিপ্রমাণ নিম্নরূপঃ টীকা-১. দ্রষ্টব্য)

টীকা-১.

যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখাকে বৈধ মনে করেন তাদের যুক্তি প্রমাণ হলো ঃ

১. সূরা নূরের ৩১নং আয়াতের এ অংশ ঃ "তারা (মুসলিম নারীরা) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে আপনাআপনি যে সৌন্দর্য বেরিয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।" এই আলেমগণ মনে করেন, মুখমণ্ডল আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে। কাজেই এটা ঢেকে রাখা জরুরী নয়।

২. হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীস যে, "একবার হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরে রসূল (সা) এর ঘরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে রাসূল (সা) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, "আসমা, মেয়েরা যখন বয়োপ্রাপ্তা হয়, তখন তার শরীরের কোন অংশ দেখা যায় এমনভাবে চলাফেরা ও পোষাক পরা বৈধ নয়। তবে এই এই অংগের কথা ভিন্ন।" এই বলে তিনি হাত ও মুখ দেখালেন। (আবু দাউদ)

৩. নামায ও ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ, হওয়া থেকে বুঝা যায় এটা নারী গোপন অংগ নয় এবং তা ঢেকে রাখা জরুরী নয়।

পক্ষান্তরে যারা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব মনে করেন এবং খোলা রাখা অবৈধ মনে করেন তাদের যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ

১. সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" এ অংশটি মুসলিম নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলিম নারী কিছুতেই তার শরীরের কোন সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে না। মুখমণ্ডল অনাবৃত করার তো প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা শরীরের প্রকৃত সৌন্দর্য তো তার মুখমণ্ডল। আয়াতের অপর অংশে "তবে যা স্বতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র" থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে পড়া সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হবে, বাতাসের ঝাপটায়, পথের পার্শ্বের কোন জিনিসে কাপড় আটকে গিয়ে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় শরীরের কোন অংশ বেরিয়ে পড়লে সেই অংশ, অথবা যে বস্ত্র দ্বারা শরীর ঢাকা হয় যথা বোরকা বা চাদর ইত্যাদি। বের করা ও বেরিয়ে পড়া কখনো এক কথা নয়।

২. সূরা আল-আহযাবের ৫৭ নং আয়াত ঃ "হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের, এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিকতর ভালো নিয়ম। যাতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।"

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে তারা যেন মাথার ওপর থেকে চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়। তবে একটি চোখ খোলা রাখা যাবে।" (তাফসীরে ইবনে

www.amarboi.org

জারীর তারাবী ও তাফসীরে জালালাইন, আহকামুল কুরআন ঃ আবু বকর জাসসাস, তফসীরে কবীর; ইমাম রাযী, তাফসীরে বায়যাবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, গারায়িবুল কুরআন ঃ আল্লামা নিযামুদ্দিন নিশাপুরী, তাফসীরে কাশশাফ ঃ আল্লামা যমখশরী, তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা মওদূদী দ্রষ্টব্য) এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতটিতে সেই নববী যুগের পবিত্র পরিবেশেও 'উত্যক্ত হওয়া'র সম্ভাবনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়াকেই এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বর্তমান যুগে, যখন নারীদেরকে প্রেম নিবেদন ও চিঠি প্রদান থেকে শুরু করে এসিড নিক্ষেপ ও হত্যা করার পর্যায় পর্যন্ত উত্যক্ত করা চলছে, তখন মুখমণ্ডল ঢাকার আবশ্যকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই অবান্তর। অথচ বোরকা পরিহিত ও নিকাব পরিহিত মুখমণ্ডল ঢাকা মেয়েদেরকে সাধারণত উত্যক্ত হতে হয়না।

৩. সূরা আল-আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"যখন তোমরা তাদের (মুসলিম নারীদের) কাছ থেকে কিছু চাইবে, তখন তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" এ আয়াতটি নবীর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হলেও সকল মুসলিম নারীর জন্যই প্রযোজ্য। কেননা সকল মুসলিম নারীর জন্যই তারা আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। এ বিধান যদি তাদের জন্য নির্দিষ্ট হতো, তাহলে আয়াতে বলে দেয়া হতো যে, "এ বিধান শুধু তোমাদের জন্য", যেমন সূরা আহযাবের অন্য আয়াতে রাসূল (সা) কে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে বলা হয়েছে, "এটা শুধু তোমার জন্য, মুমিনদের জন্য নয়।" বস্তুত ৫৩ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর গোটা শরীরই অ-মুহরিম পুরুষদের কাছ থেকে গোপনীয় ও আচ্ছাদনযোগ্য। (মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী ঃ তাফসীরু আয়াতিল আহকাম, ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৫৬)

৫. সূরা আল-আহযাবে পর্দার বিধান নাযিল হবার পর মুসলিম সমাজে যে ধরনের পর্দা চালু করা হয়, তাতে মুখমণ্ডল ঢাকাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) এর যুগে মুখমণ্ডল ঢাকার ব্যবস্থাই চালু ছিল। যেমন (ক) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার বর্ণনা, যা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেন, "প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এসে দেখি, কাফেলা চলে গেছে। তখন আমি ওখানেই বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমিয়ে গেলাম। সকাল বেলা সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় কাউকে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে চিনতে পেরে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়লেন। তাঁর এই ইন্না লিল্লাহি . . . পড়ার শব্দে আমি জেগে গেলাম এবং আমি নিজের চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

(খ) আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হয়। তিনি তার খবরাখবর জানবার জন্য রাসূল (সা) এর কাছে এলেন। এই সময় তার চেহারা নেকাবে ঢাকা ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন ঃ এমন সময়েও তোমার চেহারা নেকাবে ঢাকা রয়েছে? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো মায়ের হুঁশ থাকেনা। অথবা তুমি এত শান্তভাবে পর্দার সাথে এসেছ। ঐ মহিলা জবাব দিলেন, "আমি ছেলেকে হারালেও লজ্জা হারাইনি।"

(গ) এহরাম অবস্থায় মুখ ঢাকা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন যে, "বিদায় হজ্জের সফরে এহরাম অবস্থায় মক্কা যাওয়ার সময় আমরা বিপরীত দিক থেকে পুরুষ হাজীদের আসতে দেখলেই চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলতাম।" (তাফহীমুল কুরআন ঃ মওলানা মওদূদী)

৫. মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে হযরত আয়েশার (রা) সূত্রে আসমা বিনতে আবু বকরের যে হাদীসটি পেশ করা হয়, বর্ণনা সূত্রে তা খুবই দুর্বল। হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ আয়েশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খালেদ ইবনে দুরাইক। অথচ এই খালেদ হযরত আয়েশার সাক্ষাত লাভ করেননি। হাদীসটির অপর একজন বর্ণনাকারী সায়াদ ইবনে বশীর আবু আব্দুর রহমান আল বসরীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে

www.amarboi.org

আর এই অনুমোদিত অংগগুলিও কোন সাজসজ্জা ছাড়াই প্রকাশ করা যাবে। সুতরাং চুল, বুক, ঘাড় ও দুই বাহু প্রকাশ করা যাবেনা- যেমনটি পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত অনেক নারীই করে থাকেন।

২. যথারীতি পর্দায় আবৃত হয়েও কোন পর পুরুষের সাথে কোথাও নির্জনে অবস্থান করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন পরপুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলে সেখানে শয়তান হয়ে থাকে তৃতীয় ব্যক্তি। আর এটা যে বহু দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে, সেটা অসংখ্য ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজন বিদিত।

অনেকে আপত্তি করেছেন। (মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ) সুতরাং এরূপ একটা হাদীস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সনদের কথা বাদ দিলেও হাদীসটি কুরআনের পর্দা বিধান নাযিল হবার পূর্বেকার হতে পারে এবং পর্দার বিধান নাযিল হবার পর তা রহিত হয়ে যায়। (মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনী ঃ তাফসীরু আয়াতিল আহকাম ঃ ২য় খন্ড ঃ পৃঃ ১৫৭)

৬. নামায ও ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতিকে অমুহাররম পুরুষদের সামনেও মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারার যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো নিতান্তই ভুল। এ ব্যাপারে ৪ নং এর (গ) এ বর্ণিত হযরত আয়েশার হাদীস দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ইহরামের বিধিতে নিকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। আর নামাযে সতর ঢাকার হুকুম রয়েছে। পর্দা করার হুকুম নেই। কেননা নামায পর পুরুষদের মধ্যে পড়তে হয় না।

৭. সূরা নূরের ২৯ ও ৩০ নং আয়াত ও একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, অমুহরিম নারীর দিকে তাকানো হারাম। রাসূল (সা) হযরত আলীকে প্রথম বারের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য বলে পরবর্তী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং ফযল বিন আব্বাস যখন অমুহরিম স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন হাত দিয়ে তার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, বুখারী, দারামী) রাসূল (সা) অমুহরিম স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াকে চোখের যিনা বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) একদিকে পুরুষদেরকে দেখতে নিষেধ করা হবে, অপরদিকে মহিলাদেরকে মুখ খোলা রেখে দেখার সুযোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এমন পরস্পর বিরোধী নীতির দৃষ্টান্ত ইসলামী শরীয়তে নেই।

৮. সতর ও পর্দা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। সতর মুহরিম অমুহরিম নির্বিশেষে সকলের সামনেই ঢাকা ফরয। সতর ছাড়া বাকী অংশ মুহাররম পুরুষদের সামনে খোলা জায়েয। কিন্তু অমুহাররম পুরুষদের সামনে সেই অংশগুলোও খোলা জায়েয নেই। এটাই পর্দা। যারা মনে করেন, নারীর মুখমণ্ডল ও হাত সবার সামনে খোলা রাখা জায়েয, তারা সতর ও পর্দাকে একাকার করে ফেলেন। সতর ঢাকার হুকুম সূরা আন্ নূরের ২৯ ও ৩০ নং আয়াতে এবং পর্দার হুকুম সূরা আল আহযাবের ৫৩ ও ৫৯ নং আয়াতে এসেছে। সুতরাং সতর ঢাকলেই পর্দার বিধান পালিত হয় না।

৯. আল কোরআন ও হাদীসের উক্তি ও ইমামগণের মতামতের পর সাধারণ বিবেকবুদ্ধির বিচারে যে সিদ্ধান্ত আসা স্বাভাবিক তা নিম্নরূপ ঃ

ক. আল্লাহ নারী-পুরুষকে যে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পর্দার বিধান নাযিল করেছেন, সে উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য।

খ. অংলকার পরা ও প্রসাধনী মাখা অংগপ্রত্যংগ এবং চুল প্রকাশ করা যখন সবার মতেই নিষিদ্ধ, তখন এগুলোর চেয়ে বেশী সৌন্দর্যমণ্ডিত ও বেশী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অংগ মুখমণ্ডলকে ঢাকা অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বিশেষত বর্তমান যুগের চরম নৈতিকতাহীন পরিবেশে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্যও জরুরী। কেবলমাত্র চিকিৎসা ও অন্যান্য অনিবার্য প্রয়োজনেই এর কড়াকড়ি শিথিলযোগ্য। (অনুবাদক)

www.amarboi.org

তাই স্বামীর বন্ধু বা পারিবারিক বন্ধু ইত্যাদি যে নামেই পরিচিত হোক, কোন পরপুরুষকে বা গায়রে মুহাররম আত্মীয়কে নিভৃত গৃহে প্রবেশ করতে দেয়া কোন নারীর পক্ষে বৈধ নয়।

৩. সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বা সম্মেলন ইত্যাদিতে নারীর পক্ষে পর্দায় আবৃত হয়েও পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা বৈধ নয়। কেবল তিনটি ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম ঃ

(ক) ইবাদাতের স্থান ঃ জুময়ার নামায ও ওয়াক্তিয়া নামাযের জামায়াতে মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকলে হাজির হওয়া যাবে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদিতে ঃ এখানেও নারীদেরকে পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক ও পর্দাসহ অবস্থান করতে হবে।

(গ) জিহাদের ময়দানে ঃ যখন ইসলামী সরকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে জিহাদের ডাক দেবে, তখন পুরুষদের সাথে বের হওয়া যাবে। কিন্তু এখানেও পৃথক অবস্থান ও পৃথক সমাবেশ জরুরী।

এই সব বিধির ক্ষেত্রে ইসলামের দর্শন তার নারী সংক্রান্ত দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম মনে করে যে, নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তার সেই সব অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়া জরুরী, যা তার শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার সাথে মানানসই। সেই সাথে তাকে সন্দেহ সংশয় থেকে ও তার সতিত্বের জন্য ঝুকিপূর্ণ স্থানগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা অপরিহার্য। এতে একজন বিবাহযোগ্য তরুণী হিসাবে তার সুনামও রক্ষিত হবে এবং তার পানিপ্রার্থী যুবকদের উৎসাহ ও প্রতিযোগিতায় কখনো ভাটা পড়বেনা। অনুরূপভাবে একজন পতিপরায়না সতী সাধবী স্ত্রী হিসাবেও তার সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। আর একজন মা হিসাবেও সে জানতে পারবে ছেলে মেয়েদের মনমগজে সততা, সতিত্ব, ভদ্রতা এবং শালীন ও মার্জিত আচার আচরণের বীজ কিভাবে বপন করতে হয়।

যেখানেই নারীর জন্য এ ধরনের নিরাপদ, শালীন ও পবিত্র পরিবেশের অভাব দেখা দেবে, সেখান থেকেই নারীকে ইসলাম সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তা সে ব্যক্তিগতভাবে কোন নারী যতই মহিয়সী ও সতী সাধবী হোক না কেন। কেননা একবার সন্দেহ সংশয়ের কবলে পড়লে দুর্মুখদের অপপ্রচার ভালো-মন্দ কোন নারীকেই রেহাই দেয়না। তাছাড়া মানুষের কু-প্রবৃত্তি সব সময় কু-কাজে উৎসাহিতই করে। স্বাভাবিক পরিবেশে একজন নারী ও পুরুষ নিভৃতে মিলিত হলে উভয়ের মধ্যে প্রথমে কথা বলার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই কথাবার্তা আরো ঘনিষ্ঠতার দিকে টেনে নেয়। তাই ভবিষ্যতের অনুতাপ ও অনুশোচনার চেয়ে সন্দেহের ঝুকি ও বিপদাশংকার দ্বার আগেভাগে রুদ্ধ করে দেয়া অধিকতর সতর্কতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এই সমস্ত কারণেই ইসলাম নারী ও পুরুষের নিভৃত ও অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে রোধ করে। মানবতা, ঔদার্য ও মহত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের সকল সভ্যতার শীর্ষে যে

www.amarboi.org

ইসলামী সভ্যতার অবস্থান, তার ভিত্তি নারী ও পুরুষের মাঝে এই দূরত্ব সৃষ্টির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই দূরত্ব মুসলিম উম্মাহর উন্নতি, প্রগতি এবং মানব সভ্যতার বিনির্মাণে তার ঐতিহাসিক ও চিরঞ্জীব ভূমিকা পালনকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করেনি।

আজ যখন পাশ্চাত্যবাসীর বিভিন্ন রীতি প্রথা ও কৃষ্টির আগ্রাসন আমাদের সমাজকে ব্যাপকভাবে কলুষিত করতে শুরু করেছে, তখন আমাদের মুসলিম সমাজগুলোও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ও সিনেমা হলগুলোতে নারী ও পুরুষের একত্র সমাবেশের ব্যবস্থা চালু করতে আরম্ভ করেছে। ক্রমে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতেও এই একত্র সমাবেশের প্রচলন হয়েছে। এ সব অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের জন্য পুরুষগণকে সস্ত্রীক আগমনের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ হয়েছে। এমনকি পরিতাপের বিষয় যে, যে সব আরব দেশ সারা দুনিয়ায় ঐতিহ্যবাহী ইসলামী দেশ হিসাবে খ্যাত, তারাও তাদের দূতাবাসের অনুষ্ঠানাদিতে এ ধরনের সমাবেশ করছে। অথচ তাদের উচিত ছিল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করে নিজ নিজ দেশের জনগণের ইসলামী চরিত্র ও চালচলনের প্রতিনিধিত্ব করা। তাদের এটা লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল, যে পাশ্চাত্যের রীতি প্রথার অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে তারা এরূপ করছে, সেই পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণী লোকেরাই এখন এগুলোর সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

প্রসংগত ঃ নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সমৃদ্ধির কত বড় সর্বনাশ সাধন করেছে এবং প্রাচীন রোমক ও গ্রীক সভ্যতার পতন ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অধপতনে কী সাংঘাতিক অবদান রেখেছে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

একথা ঐতিহাসিকভাবে সুবিদিত যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীর বেলেল্লাপনা, পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা এবং অতিমাত্রায় প্রকাশ্য সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী।

রোমকদের ক্ষেত্রেও অবিকল এটাই ঘটেছিল। তাদের সভ্যতার উত্থানের যুগে নারীরা ছিল পুরবাসীনী ও পতিব্রতা। এর ফলে তারা দেশের পর দেশ জয় করতে পেরেছে এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার সংহত করতে পেরেছে। অতঃপর যখন তাদের নারীরা সাজগোজ করে রাস্তাঘাটে, সভা সমিতিতে ও বাজারে বেরুতে আরম্ভ করলো, তখন পুরুষদের চরিত্র বিনষ্ট, ও রন নৈপুণ্য ব্যাহত হলো এবং তাদের সভ্যতার এমন পতন ঘটলো, যা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষে বলা হয়েছে ঃ

'রোমকদের আমলে নারী একদিকে যেমন পতিব্রতা ছিল, অপরদিকে তেমনি কর্মঠও ছিল। তারা বাড়ীতে বসে চরকায় সূতা কাটতো ও পশম বাছতো। আর স্বামী ও পিতারা চলে যেত দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানে।'

www.amarboi.org

এরপর তারা বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদের নেশায় মেতে উঠে নারীদেরকে ঘরের বাইরে টেনে নিতে আরম্ভ করলো, যাতে তারা তাদের প্রণয় ও প্রমোদের সংগিনী হয়। দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে দেহের যেরূপ অবস্থা হয়, গৃহ থেকে নারীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর রোমক জাতির সেই অবস্থাই হলো। পুরুষরা নিছক নিজেদের কাম লিপ্সা চরিতার্থ করতে নারীদের চরিত্র, সতিত্ব ও লজ্জা ধ্বংস করতে লাগলো। ক্রমে নারীরা নাচ-গানের জলসার মধ্যমণি হয়ে উঠলো। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতার মসনদেও তাদের অংগুলি হেলনে পুরুষদের উত্থান পতন ঘটতে লাগলো। এঅবস্থা চলতে চলতে এক সময় রোম সাম্রাজ্যের শোচনীয় পতন ঘটলো। ইতিপূর্বে গ্রীসেও যখন নারীদের লাগামহীন বেলেল্লাপনা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা শুরু হয়, তখন সেখানকার পণ্ডিতেরা জাতিকে সাবধান করছিলেন। কিন্তু সে সতর্কবাণীতে কেউ কর্ণপাত করেনি এবং সে জাতির পতনও কেউ ঠেকাতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষের ৮ম খণ্ডের ৬১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

'রোম সাম্রাজ্যে যখন নারীদের আন্দোলনের কারণে বিলাসিতা ও বেহায়াপনাকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন রহিত করার উদ্যোগ নেয়া হলো, তখন তৎকালীন খ্যাতনামা রোমান দার্শনিক কানুন (খৃস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) বললেন ঃ

'ওহে রোমকগণ, তোমরা কি ধারণা করেছ যে, যে সব বিধিনিষেধ নারীদেরকে নিয়মশৃংখলা মেনে চলতে ও স্বামীদের অনুগত থাকতে বাধ্য করে, সে সব বিধিনিষেধের বন্ধন তাদেরকে ছিন্ন করে ফেলার সুযোগ দেয়ার পর তোমরা তাদেরকে আর বরদাশত করতে পারবে এবং তাদের চালচলনে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে!

এসব আইন থাকা সত্ত্বেও কি তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন মনে হচ্ছেনা? তারা যে অচিরেই আমাদের সমান অধিকারই শুধু চাইবেনা বরং আমাদেরকে তাদের আঁচলের নীচে ঢুকাবার চেষ্টা চালাবে, তার লক্ষণ কি তোমার দেখতে পাচ্ছনা? আমি বুঝিনা, নারীদের আন্দোলনের পক্ষে কী যুক্তি আছে। আমাকে এক নারী যুক্তি দেখিয়েছে যে, 'আমরা তো কেবল স্বর্ণের অলংকারাদি ও লাল রেশমী পোশাক পরতে চাই, উৎসবের দিন ও অন্যান্য দিনে রাস্তায় চলাফেরা করতে চাই, পুরুষদের সাথে অবাধ মেলা মেশার বিধিনিষেধ আরোপকারী আইন বাতিলে আমাদের বিজয়কে প্রদর্শনের জন্য বড় বড় গাড়ীতে করে যাতায়াত করতে চাই, তোমাদেরকে নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের অধিকার প্রয়োগ করতে চাই এবং আমাদের ব্যয় ও বিলাসিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তোমরা কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেনা, সেই অনুরোধ জানাই।'

'হে রোমবাসী, তোমরা বহুবার শুনেছ যে, আমি পুরুষ, নারী, সাধারণ মানুষ ও আইন প্রণয়নকারীদের অমিতব্যয়িতার কঠোর সমালোচনা করে থাকি। আমি বলে থাকি যে, প্রজাতন্ত্র এখন দুটো রোগে জর্জরিত; প্রতিহিংসা ও বিলাসিতা। এই দুটো রোগ বহু বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছে।'

www.amarboi.org

অতঃপর ১৯শ শতাব্দীর বিশ্বকোষ বলেছে ঃ 'কানুন ঐ' আইনের রক্ষণাবেক্ষণ সফল হয়নি বটে, তবে তাঁর সতর্কবাণীগুলো বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের সমাজ জীবনে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগরত নারীদের গর্হিত রুচি এবং সদাসর্বদা সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চা রোম সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে।

বিশ্বকোষটি আবারো বলছে ঃ 'আমরাই যে সর্ব প্রথম নারীদের সৌন্দর্য-প্রদর্শনীর অশুভ নৈতিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি তা নয়। আমাদের খ্যাতনামা লেখকগণ এ বিষয়ে লিখতে কখনো ভুলেননি। আমাদের বর্তমান নগর জীবনকে কলুষিতকারী এবং আমাদেরকে আসন্ন পতনের হুমকিদানকারী এই ভয়াবহ রোগ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেটাই এখন ভাবনার বিষয়। সত্যি বলতে গেলে এ ব্যাধির কোন ওষুধই নেই।'

লক্ষ্যণীয় যে, রোম সাম্রাজ্য নারীদের মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রদর্শনী ও অবাধ মেলামেশার ফলে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, ইউরোপীয় বিজ্ঞজনেরা ইতিমধ্যেই তা থেকে সাবধান করতে আরম্ভ করেছেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত লুইস ব্রোল 'রাজনৈতিক দুর্নীতি' শীর্ষক এক নিবন্ধে বলেন ঃ

'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপথগামিতা ও দুর্নীতি সর্বকালেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই দুর্নীতি ও বিপথগামিতার মূল কারণ অতীতে যা ছিল এখনো তাই আছে। অর্থাৎ নারীই মহৎ চরিত্র বিনাশের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ।'

তিনি বর্তমানকাল ও রোম প্রজাতান্ত্রিক যুগের সতর্কতা সংকেত প্রদানকারী চিহ্নগুলোর তুলনা করে বলেন ঃ

'রোম প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকের রাজনীতিকগণ চরিত্রহীনা নারীদের সাহচর্যে জীবন-যাপন করতো এবং এ ধরনের নারীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আজকের অবস্থাও তথৈবচ। আমোদ প্রমোদ, ভোগবিলাস ও প্রেম প্রণয়ে ডুবে থাকার প্রবণতা উন্মত্ততার সীমায় পৌঁছে গেছে।'

বিশিষ্ট বৃটিশ লেখিকা লাডীকোক 'আলায়েকো' নামক পত্রিকার এক নিবন্ধে বলেন ঃ

'নরনারীর অবাধ মেলামেশা পুরুষরা খুবই পছন্দ করে। আর এ জন্য নারীদের স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীদেরকে প্রলুব্ধ করে অবাধ মেলামেশায় প্ররোচিত করা হয়। আর এটা যত বাড়ে, ব্যভিচার ও জারজ সন্তানের সংখ্যাও ততই বাড়ে। আর এখানেই রয়েছে নারীর সবচেয়ে কঠিন বিপদ।'

'পাশ্চাত্যের নগর জীবনে কলংক আমদানীকারী এই বিপদটা দূর করা না গেলেও এটা কমানোর কথা ভেবে দেখার সময় কি এখনো আমাদের আসেনি? এখনো কি আমাদের এমন কর্মপন্থা অবলম্বনের সময় হয়নি যা হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু হত্যা (অর্থাৎ জারজ শিশু) রোধ করতে পারে? ঐ সন্তানদের তো কোন অপরাধ ছিল না। আসল অপরাধী তো ঐ সব পুরুষ, যারা স্বভাবসুলভ কোমলহৃদয়া নারীদেরকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।'

www.amarboi.org

'ওহে পিতামাতা ঃ আপনাদের মেয়েরা কলকারখানায় চাকুরী করে যে ক'টা টাকা উপার্জন করে এনে দেয় এবং যার ফলে উপরোক্ত ধরনের অশুভ পরিণাম ভোগ করে, তা নিয়ে গর্বিত হবেন না। তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের কাছ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিন। তাদের জন্য যে চক্রান্তপূর্ণ প্রেমের জাল ছড়ানো থাকে, তাতে আটকা পড়ার পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে হুশিয়ার করে দিন। পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বেশী হয়, সেখানেই ব্যভিচারজনিত গর্ভধারনের ঘটনা বেশী ঘটে। জারজ সন্তানদের মায়েরা অধিকাংশই যে কারখানার শ্রমিক অথবা বাসাবাড়ীর চাকরানী, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গর্ভপাতের জন্য যদি ডাক্তাররা ওষুধ না দিত, তা হলে এ পরিসংখ্যান হয়তো কয়েকগুণ বেশী হতো। এ পরিস্থিতি আমাদের নারীদের মর্যাদা এত নীচে নামিয়ে দিয়েছে, যা কল্পনাও করা যায়না। এটাই আমাদের নগর সভ্যতার পতনের সর্বনিম্ন ধাপ।'

'নারীদের প্রসংগে কিছু কথা' এই শিরোনামে জার্মান দার্শনিক শোবিনহোর বলেন ঃ

'পুরুষের উচ্চ মর্যাদায় ও আভিজাত্যে অংশীদার হওয়ার জন্য নারীকে আহ্বান জানানোই আমাদের সমাজ বিন্যাসের সবচেয়ে মারাত্মক ক্রটি। এটাই নারীকে নিকৃষ্ট রুচি নিয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ সহজ করে দিয়েছে এবং নারীর এই নিকৃষ্ট ধ্যান-ধারণা ও উচ্চ পদমর্যাদার সংমিশ্রণেই আধুনিক নগর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।'

শোবিনহোর আরো বলেন ঃ

'প্রসংগত ঃ লর্ড বায়রনের একটি কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "প্রাচীন গ্রীসে নারীরা যে অবস্থায় ছিল, সেটা বিবেকগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু নারীদের বর্তমান অবস্থা মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবশিষ্টাংশ ছাড়া আর কিছু নয়, যা অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। এসব পর্যালোচনা করলে পাঠক নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, নারীদেরকে কেবল গৃহস্থলী কাজে নিযুক্ত রাখা, গৃহাভ্যন্তরেই তাদেরকে ভালো খাবার ও পোশাক দেয়া, পরপুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে রাখা ও পর্দার আড়ালে রাখা, তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া, কবিতা ও রাজনীতি থেকে তাদেরকে দূরে রাখা এবং ধর্ম ও রান্নাবান্নার পুস্তকাদি ছাড়া আর কোন বই-পুস্তক পড়তে না দেয়া উচিত।' অবশ্য নারী সম্পর্কে শোবিনহোরের ন্যায় চরমপন্থী ধ্যান ধারণা ইসলাম সমর্থন করেনা। কেবল পাঠকের বিবেচনা ও শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে কথাটা উদ্ধৃত করলাম।

অধ্যাপক জিওম ফ্রে বলেন ঃ

'আমরা যে ধরনের নগর জীবনে বসবাস করছি, তার চরম সংকট ঘনিয়ে আসার অনেকগুলো লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। গবেষকরা প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন সতর্কবাণীর সন্ধান পাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত ডাক্তাররা আমাদের যুগে সামাজিক ব্যাধির (অবাধ মেলামেশা ও ব্যভিচার) যে প্রতিকার উদ্ভাবন করেছেন, তা বাস্তবায়নে সাহায্য করতে

www.amarboi.org

আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। সেটা হচ্ছে এমন এক অভিজ্ঞ ধরনের বৈরাগ্য, কোন ধর্মের সাথে যার সম্পর্ক নেই এবং যা মধ্যযুগীয় চরম ধরনের ধর্মীয় বৈরাগ্যবাদের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুকি সৃষ্টি করবেনা।'

উপসংহারে তিনি বলেন ঃ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা নারীর কাছ থেকে অবিবাহিত জীবনে সতিত্ব কামনা করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই সতিত্ব বজায় রাখতে হলে তাকে বিবাহ পূর্ব মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

মহিলাদের চাকুরী করা অপরিহার্য এ দাবীর যৌক্তিকতা পর্যালোচনা

যারা মনে করেন যে মহিলাদের বাড়ীর বাইরে গিয়ে কোন না কোন চাকুরী করা অত্যাবশ্যক, তাদের যুক্তি পর্যালোচনা করা খুবই জরুরী। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো, মহিলারা চাকুরী করলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাদেরকে নিজেদের ঘরকন্নার কাজে সীমিত রাখলে দেশ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া মহিলাদের মধ্যে আলসেমি ও অলাভজনক কাজে সময় নষ্ট করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর এ কারণে আমাদের দেশের কিছু কিছু মহিলা অত্যধিক মোটা হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের যে সব দেশে মহিলারা চাকুরী করে, সে সব দেশে মহিলাদের মুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা আমাদের দেশের মত তীব্র নয়।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলো মনে রাখলে এ যুক্তি সহজেই খণ্ডন করা যায় ঃ

১. নারীর চাকুরী করা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে পুরুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে বিচরণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং তাদের বেকারত্ব ব্যাপকতর হয়। আমাদের বেশীর ভাগ মুসলিম দেশে নারীরা চাকুরী করতে শুরু করার পর থেকে পুরুষদের বেকারত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারীরা বেকার হয়ে চায়ের স্টলে ভীড় জমাচ্ছে এবং চাকুরির জন্য অফিসে অফিসে ধর্না দিচ্ছে। অথচ তাদের স্থানগুলো দখল করে রেখেছে সেই সব যুবতী কর্মচারী, যাদের অধিকাংশই পুরুষদের সমান যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী নয়- ইদানিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে।

২. যখন প্রমাণিত হলো যে, মহিলাদের চাকুরী পুরুষদের বেকারত্বের জন্ম দেয়। তখন এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, একটি কর্মজীবী মহিলা তার নিজেরই স্বামী, পিতা বা ভাই এর বেকারত্বের কারণ হচ্ছে। আর যে পরিবারের স্ত্রী সদস্যের চাকুরির দরুণ ঐ পরিবারের প্রধান এবং ঐ নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব বহনকারী পুরুষ বেকার হয়ে যায়, সে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভবান হয়?

৩. জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি সব সময় নিছক অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায়না। যেমন যদি ধরেও নেই যে, নারীর চাকুরিতে জাতীয় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে। তবুও একথা

www.amarboi.org

অস্বীকার করা যাবেনা যে, এ দ্বারা জাতির অপূরণীয় সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতিটা হয়ে থাকে পারিবারিক সংহতি ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে। আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নারীর চাকুরি করার কারণে পাশ্চাত্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়েছে এবং ছেলেমেয়েদের চরিত্র ধ্বংস হয়েছে। এখন ভেবে দেখতে হবে যে, অর্থনৈতিক ক্ষতি ও সামাজিক ক্ষতি— এই দুই ক্ষতির মধ্যে জাতির জন্য কোন্‌টা অধিকতর সর্বনাশা।

দেশকে বাড়তি সম্পদ উপার্জন করে দেয়ার জন্য যারা নারীর চাকুরী করার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী অনুভব করে, তারা লক্ষ্য করেনা যে, পরিবারের অখণ্ডতা ও সংহতি বিনষ্ট হলে এবং ছেলেমেয়েদের লালন পালনের জন্য অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কের অভাব ঘটলে দেশ ও সমাজের কত ক্ষতি হয়। এ ধরনের লোকেরাই নিরেট অর্থনৈতিক ও বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারী হয়ে থাকে এবং এটা প্রকৃত পক্ষে কম্যুনিষ্টদের দর্শন। কোন মানব সমাজ যদি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক মূল্যবোধকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অগ্রাধিকার দেয় অথবা একে দুষণীয় মনে করে, তবে সে সমাজের সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কিছুতেই পূর্ণাংগ হতে পারে না। আমাদের সমাজ একটা ধর্মভীরু ও ধর্মপ্রাণ সমাজ। ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতেই এ সমাজের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও আচার আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যে দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কম্যুনিষ্ট সভ্যতা পরিবারকে দেখে থাকে, একটা মুসলিম সমাজ তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে পারেনা। যদি পারতো, তাহলে সেটা হতো এ সমাজের ধর্ম, আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবীয় চেতনার জন্য ধ্বংসাত্মক।

সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে নিছক একটা উৎপাদক যন্ত্র রূপে বিবেচনা করা, এবং রাষ্ট্রকে তার উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির নিরীখে দেখা মানুষের অগ্রগতি নয় বরং পশ্চাদবর্তী হওয়ার লক্ষণ। এটা জাতিকে গোলামী ও পরাধীনতার যুগের দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের ধর্মভীরু,স্নেহমমতায় সিক্ত ও উচ্চতর নৈতিকতার আদর্শে উজ্জীবিত সমাজে এ ধরনের মানসিকতা অচল ও প্রত্যাখ্যাত।

৪. উপরন্তু এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সমাজ জীবনে এবং অন্যান্য সমাজের জীবনে বাস্তবানুগও নয়। এমনকি কম্যুনিষ্ট সমাজেও নয়। বরং প্রত্যেক সমাজেই কিছু কিছু শ্রেণী এমন থাকে, যাদেরকে দেশের উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। যেমন সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীরা জাতির অর্থনৈতিক উৎপাদনের সাথে জড়িত হয় না। প্রত্যেক জাতিই চায় সেনাবাহিনী দেশ রক্ষার কাজে সর্বোতভাবে ও একাগ্রভাবে নিয়োজিত থাকুক। সম্পদ ও অর্থ উপার্জন করে জাতির সমৃদ্ধি এনে দেয়ার দায়িত্ব তাকে অর্পন করা হয়না। তা বলে কেউ কি এ কথা বলবে যে, এতে একটি জাতীয় সম্পদকে নিষ্ক্রিয় ও উৎপাদনহীন করে রাখা হয়েছে এবং এর ফলে দেশে জাতীয় সম্পদের ঘাটতি হয়েছে? যারা নারীকে গৃহবহির্ভূত কর্মস্থলে চাকুরী করতে দেয়ার

www.amarboi.org

দাবী জানান, তারা যে অর্থনৈতিক উপার্জনের চেয়েও অধিক মূল্যবান জাতীয় স্বার্থের তাগিদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে অব্যাহতি দেয়া পছন্দ করেন, তা কি সত্য নয়? তা যখন সত্য, তখন হিসাব করে দেখা দরকার যে, পারিবারিক কর্মকাণ্ডের নারীর একাগ্রভাবে মনোযোগ দেয়া ও আত্মনিয়োগ করাটা কি দেশ রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীর একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগের চাইতে কম উপকারী? আর এর একমাত্র বিকল্প হিসাবে এটাও ভেবে দেখা দরকার যে, সর্বসম্মতভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লিংগ হিসেবে বিবেচিত নারীর ওপর ভেতর ও বাইরের উভয় দায়িত্ব এক সাথে চাপিয়ে দেয়া কি ন্যায়সংগত হবে ?

পুরুষ হোক বা নারী হোক মানুষের জীবনকে নিছক অর্থনৈতিক ও বস্তুগত লাভ লোকসানের নিরীখে হিসেব করা হয়না। দয়া, দানশীলতা, অতিথি পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদাপালন, পরোপকার, ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাকার গুণাবলী যে আর্থিক বিচারে কিছু না কিছু ক্ষতি ও লোকসানের কারণ হয়ে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবিক ঔদার্য, মহত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী সম্ভ্রান্ত মানুষেরা এ গুণগুলোকে বিরাট লাভ ও গৌরবজনক সম্পদ মনে করে থাকে এবং এগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া কোন অবস্থায় পছন্দ করে না। মানবতাবাদী উন্নত মানুষের চোখে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ যত্ন ও সন্তানদের লালন পালন ঐ সব নৈতিক গুণাবলীর চেয়ে কোন অংশে কম মূল্যবান নয়। এবং বস্তুগত মাপকাঠিতে মেপে এর মূল্য নিরূপণ করা যায়না।

মোট কথা, যে কোন জাতির জীবনে দেশ রক্ষার লড়াই অথবা আগ্রাসী হানাদারদের দখল থেকে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম অত্যন্ত পবিত্র ও প্রশংসনীয় কাজ। এ সংগ্রামের সত্যিকার প্রয়োজন যখন কোন জাতির জীবনে দেখা দেয় তখন কোন অজুহাতেই তা স্থগিত রাখা সম্ভব হয়না। অথচ সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও আইনসংগত এ লড়াই-এ বিপুল আর্থিক ও মানবিক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। কোন জাতি কি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি, জাতীয় সম্পদের লোকসান, ও উৎপাদনের ঘাটতির দোহাই পেড়ে সেনাবাহিনীকে অবসর দিয়ে দিতে পারবে? পারবে কি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় ও নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে এবং আগ্রাসী হানাদারদের প্রতিরোধে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে ?

৫. নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকাতে অলস হয়ে যায় এবং এ কারণে পাশ্চাত্যের নারীদের চেয়ে আমাদের নারীরা অধিক মুটিয়ে যায়, এ কথার কোন অর্থ আমার বুঝে আসেনা। যারা এ কথা বলে, তারা গৃহস্থালির ব্যস্ততা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত মহিলারা যে কত শ্রান্ত ক্লান্ত হয় এবং সারা দিনের খাটনিতে অবসন্ন হয়ে বিকালে একটু অবসর পেয়ে পাড়াপড়শী ও বান্ধবীদের সাথে কিঞ্চিৎ মেলামেশা করে যে কত স্বস্তি পায়, সেটা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে।

মেয়েরা যতদিন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, ততদিন তো চাকুরী করে তার খাটনি বাড়ানোর কোন যুক্তিই নেই। আর লেখাপড়া শেষে যত দিন মা বাপের

www.amarboi.org

বাড়ীতে কাটায়, সে ক'দিন তো তার বিয়েশাদী ও স্বামীগৃহে যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই কাটে। এ সময়ে সে তার মায়ের কাছ থেকে ঘরকন্নার কাজ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ লাভ করে। সুতরাং এ সময়ে তাকে বাড়ীর বাইরে চাকুরির জন্য পাঠানো অস্বাভাবিক ও অন্যায়।

এ প্রসংগে আমি যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে চাই তা এই যে, নারীর গৃহস্থলির কর্মব্যস্ততা খাটনির দিক দিয়ে বাইরের কোন চাকুরির ব্যস্ততার চেয়ে কোন ক্রমেই কম নয়। বরঞ্চ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা অধিকতর কষ্টকর ও ক্লান্তিকর।

প্রাচ্যের নারীদের মোটা হ'য়ে যাওয়ার ধারণাটা এতই হাস্যকর যে, নারীদের চাকুরি করার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী লোকেরা এ বিষয়টা নিয়ে অত্যধিক চেঁচামেচি না করলে এ নিয়ে আলোচনা করারই প্রয়োজন মনে করতাম না। আসলে মোটা ও চিকন হওয়ার বিষয়টা খাদ্যাভাসের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। আমাদের প্রাচ্যজগতে খাদ্য গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত, সেটাই মূলত মানুষের মোটা হওয়ার জন্য দায়ী এবং সেটা নারী ও পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

সত্য বলতে কি, প্রাচ্যবিশ্বে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই মোটা হওয়ার প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। আর পাশ্চাত্যে পুরুষদের চাইতে নারীদের স্থূলতার প্রবণতাই বেশী। মোটা বা চিকন হওয়ার ব্যাপারটা যে খাদ্যাভ্যাসের সাথেই জড়িত, তার আরো একটা প্রমাণ এই যে, মরুবাসী বেদুঈনরা খুব কমই মোটা হয়ে থাকে। আমি কোন কোন সময় হজ্জ করতে গিয়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় তিন লাখ বেদুঈনকে সমবেত হ'তে দেখেছি। আমি তখন লক্ষ্য করেছি যে, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই স্থূলকায়। বরঞ্চ এত বিপুল সংখ্যক বেদুঈনের মধ্যে আমি কাউকেই চোখে পড়ার মত মোটা দেখিনি। সুতরাং বিষয়টা ব্যস্ততা বা বিশ্রামের সাথে নয় বরং খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যের ধরনের সাথে জড়িত।

বিপদাশংকা

ওপরের সমস্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নারীর অশালীন চালচলন এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলির কারণে রোম ও গ্রীক সভ্যতার ন্যায় এ যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে বিপদের আশংকা দেখা দিয়েছে, সে আশংকাটা আমাদের মুসলিম বিশ্বেও ঘনীভূত হয়েছে। তবে একদিক দিয়ে এই দু'টিতে একটু পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটি এইযে, নারীর অশালীন আচরণ ও বেহায়াপনা ঐ সভ্যতাগুলোর পতন ঘনিয়ে তুলেছে সভ্যতাগুলো উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার পর। আর আমাদের সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে আমরা যখন উন্নতি ও অগ্রগতির সিঁড়িতে সবে পা রেখেছি তখন। বিস্ময়ের ব্যাপার এইযে, আমাদের মধ্যকার কিছু অপরিনামদর্শী অথবা কুচক্রী ব্যক্তি আমাদের জাতির বিকাশ ও উন্নয়নের কার্যক্রমটা ঠিক সেই কর্মকাণ্ড দিয়ে শুরু করাতে

www.amarboi.org

চাইছে, যে কর্মকাণ্ড দিয়ে অন্যদের পতনের ঘন্টা বেজেছে। যে কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসী খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে য, এগুলো অচিরেই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলবে, সেই কর্মকাণ্ডেই তারা আমাদেরকে পাশ্চাত্যবাসীর অনুসারী করতে চাইছে।

যে সময়ে আমাদের জনগণ সামাজিক ও পারিবারিক স্থিতি ও একাত্মতা, প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ন্যায় দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে এখনো পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে কালাতিপাত করছে, আর পাশ্চাত্যবাসী এ সব জিনিসের অভাবে চরম হতাশা, ও আক্ষেপ অনুভব করতে শুরু করেছে, সে সময়ে আমাদের গৃহে ও পরিবারে ঐ বিপদ ডেকে আনায় জাতির কোনই কল্যাণ সাধিত হতে পারেনা।

অশ্লীল সাহিত্যের বিপদ

যে সব লেখক সাহিত্যিক নিজেদের সাহিত্যের মাধ্যমে নারীদেরকে তাদের চিরপরিচিত ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ও সৎ সাহিত্য প্রত্যাখ্যান ও অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠের প্ররোচনা দিচ্ছে এবং পাশ্চাত্যের নারীদের কুরুচিপূর্ণ ও বিপজ্জনক রীতিনীতি অনুসরণে অনুরাগী করে তুলছে, তারাই যে সমাজকে ও নারীদেরকে এই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর পথে ডেকে নেয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ও অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। অথচ লেখক সাহিত্যিকদের কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যাশা ছিল যে, তারা একটা পশ্চাদপদ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক এমন একটা স্বার্থক পুনর্জাগরণের প্রেরণা যোগাবেন, যা জাতির মধ্যে সংগ্রামী আবেগ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে এবং তার সুখী পারিবারিক জীবন সহ যে সকল ভালো উপাদান তার কাছে রয়েছে, তার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এতে করে আমাদের জাতি তার নবজাগরণের সংগ্রামকে একটা সুস্থ সবল ও সুসমন্বিত সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু এইসব অশ্লীল ও পর্ণ সাহিত্যের লেখকরা আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করছে। এ কাজটা তারা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েও করছেনা এবং জাতির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেও করছেনা। বরং তারা এটা করছে নিছক আপন প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার স্বার্থে এবং এই সস্তা ধ্বংসাত্মক সাহিত্য প্রচার করে আমাদের যুবক যুবতীদের চরিত্র ও ভবিষ্যত ধ্বংস করার মাধ্যমে অগাধ বিত্তবৈভবের অধিকারী হবার লক্ষ্যে।

যারা যুদ্ধ বিগ্রহ উস্কে দিয়ে জিনিসপত্রের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে এবং যারা যৌন সুড়সুড়িপূর্ণ অশ্লীল সাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়ে রাতারাতি আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়, এই দু'শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখতে পাইনে। বরঞ্চ আমার দৃষ্টিতে পর্ণ সাহিত্যের ব্যবসায়ীরা অধিকতর বিপজ্জনক ও অধিকতর সর্বনাশা। প্রশ্ন এই যে, বাক স্বাধীনতার নামে আমাদের পরিবার ও সন্তানদেরকে ধ্বংস করার এ সুযোগ আমরা তাদেরকে কেন দেব? ধ্বংসের বা আত্মহননের স্বাধীনতাকে তো

www.amarboi.org

স্বাধীনতা বলা চলেনা। স্বাধীনতাকে অবশ্যই গঠনমূলক ও প্রকৃত উন্নয়নমূলক হ'তে হবে। হাজার হাজার বছর পেছনের দিকে ঠেলে দেয়ার স্বাধীনতা কাউকেই দেয়া যায় না। আদিম যুগের যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কেবল নিজের প্রবৃত্তিতে যা চাইতো তাই করতো, কোন নিয়ম শৃংখলার ধার ধারতোনা কিংবা কোন কোন সমাজেরও তোয়াক্কা করতোনা, সেই অন্ধকার যুগে মানব সমাজকে নিয়ে যাওয়ার সর্বনাশা স্বাধীনতা আমরা কাউকে দিতে পারিনা।

আশ্চর্যের ব্যাপার এইযে, এইসব অশ্লীল সাহিত্যের লেখকরা শুধুমাত্র চরিত্রবিধ্বংসী, পরিবার বিধ্বংসী ও বেহায়াপনা বিস্তারকারী সাহিত্যেরই জন্ম দিয়ে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। অথচ আমরা মুসলমানরা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটজনক অধ্যায় অতিক্রম করছি। এ অধ্যায়ে আমরা ইসরাইলের মত আগ্রাসী শক্তির মুকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত রয়েছি। আমরা সবাই জানি যে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজন বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য, তেজস্বিতা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে পারে এমন সাহিত্যের, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, আমোদ প্রমোদ, ভোগ বিলাস ও প্রবৃত্তিপূজায় প্ররোচনা দেয় এমন সাহিত্যের নয়।

বাক স্বাধীনতার নামে আমাদের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত এইসব লেখক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমি নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মুসলিম যুবক যুবতী, চিন্তাবিদ, বিদ্বান ও নারী সংগঠনগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। তাদেরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, তারা যেন এইসব অপরিণামদর্শী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সাহিত্যিকদের বুঝান যে, বাক শালিনতার স্থান বাক স্বাধীনতার উর্ধে এবং বাক স্বাধীনতার আগে বাক শালিনতা রপ্ত করা প্রয়োজন। তাদেরকে আরো বুঝাতে হবে যে, নরনারীর সম্পর্ক ও যৌন কর্মকাণ্ডকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করা আর এটাকে দমন করা বা হরণ করা এক কথা নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ দুটোকে এক ও অভিন্ন মনে করা তাদের উচিত নয়। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, আমরা এমন এক যুদ্ধে লিপ্ত, যার একমাত্র অস্ত্র হলো জ্ঞান, ঈমান ও চরিত্র। তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, মুসলিম পরিবারগুলোতে তথা তাদের স্ত্রী কন্যা ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যারা বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতা ঢুকাবার পাঁয়তারা করছে, তারা ভয়ংকর ধরনের ডাকাত। এই ডাকাতরা মুসলিম জাতির সবচেয়ে মূল্যবান ও সম্মানজনক সম্পদ চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীকে অপহরণ করার চক্রান্তে লিপ্ত

আমরা তাদেরকে হুশিয়ার করে দিতে চাই যে, তোমরা আমাদের মেয়েদেরকে সতী সাধ্বী থাকতে দাও। আমাদের স্ত্রীদেরকে বিশ্বস্ত ও স্বামীভক্ত থাকতে দাও, আমাদের তরুণদেরকে লম্পট ও বখাটে না বানিয়ে তাদেরও সৎ, অকুতোভয় সংগ্রামী ও বিপ্লবী থাকতে দাও। অন্যথায় আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।

www.amarboi.org

যারা আমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করতে এবং আমাদের স্বাতন্ত্রের কবর রচনা করতে চায়, তাদেরকে আমরা স্বাধীনতার নামে এমন জঘন্য অপরাধ ঘটাতে দিতে পারিনা। আমাদের অধিকার আছে আইনের বলে তাদেরকে বাধা দেয়ার। শিল্প চর্চার নামে যারা আমাদের গৃহে অশান্তির আগুন জ্বালাতে চায়, তাদেরকে এ ঘৃণ্য অপরাধ ঘটাতে আমরা কক্ষনো দেবনা। আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রয়োগ করে, আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষার মানসে এবং আমাদের জাতীয় শক্তি ও তেজবীর্য রক্ষার লক্ষ্যে আমরা তাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখবো। জাতির মূল লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে যে শিল্প সাহিত্য সহায়ক হয়না, তা কোন শিল্প সাহিত্য নয়, বরং তা ফালতু তামাশা, নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদ।

নারী স্বাধীনতার ধুয়া

নারীর সমস্যা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম এবং মিথ্যা ও ভাওতাবাজীই বেশী। মুসলিম সমাজের নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই। ইসলামই তাদেরকে স্বাধীন করেছে। এ সমস্যা পাশ্চাত্যবাসীর। এ সমস্যা তাদের কোনদিনই ঘুচবেনা। নারীর কাছে ইসলাম যে লজ্জা, শালীনতা, বিনয় এবং তার বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুবিধার্থে তার যে একাগ্রতা ও গৃহমুখীনতার দাবী জানায়, সেটা তার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করা ও দমন করার জন্য নয়, বরং সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার জন্য। কোন জিনিসকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার অর্থ তাকে দমন করা ও ধ্বংস করাও নয়, বরং এর অর্থ হলো তাকে তার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে তার সীমা লংঘন থেকে বিরত রাখা। এ দ্বারা তাকে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা হয় এবং পরিবার ও সমাজের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। আমরা সবাই এ কথা ভালো করেই জানি যে, 'দমন করা' ও শৃংখলা রক্ষা করা'র মধ্যে ঠিক ততটাই ব্যবধান, যতটা ব্যবধান 'ভাংগা' ও 'গড়ার' মধ্যে এবং 'আইনানুগতা' ও 'অরাজকতার' মধ্যে।

www.amarboi.org

উপসংহার

সারসংক্ষেপ ঃ এবারে আমি নারী সংক্রান্ত আলোচনায় এ যাবত যে মতামত ব্যক্ত করেছি, তার সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা প্রয়োজন মনে করছি :

১. নারীকে শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য। তবে তার পাঠ্যসূচী পুরুষের থেকে কিছুটা পৃথক হওয়া চাই, যাতে সে ভবিষ্যতের একজন দক্ষ গৃহিনী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

২. ইসলামের দেয়া যাবতীয় অধিকার তাকে অবশ্যই দিতে হবে। এ বিষয়ে আমি শুরুতেই বিশদভাবে আলোচনা করছি।

৩. দুর্যোগ ও যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির সংকটকালের জন্য তাকে প্রস্তুত করায় মনোযোগী হতে হবে। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হ'য়ে থাকি। তাই নারীকে বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও পারিবারিক ত্রাণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ দিতেই হবে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, অস্ত্র ব্যবহার ও নিক্ষেপ ইত্যাদির কাজে পারদর্শী হতে হবে। তবে এ সব কিছুই ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকেই অর্জন করতে হবে।

৪. সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে তার কর্মসীমা এমনভাবে নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দিতে হবে, যাতে কেবল তার স্বভাব ও মূল পারিবারিক দায়িত্বের সাথে মানানসই কোন চাকুরিতেই নিয়োগ করা হয়। যেমন মহিলা ও শিশুর চিকিৎসা, শিশু ও বালিকাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বা অনুরূপ সামাজিক ও পারিবারিক সেবা সংক্রান্ত কোন কাজ।

৫. নারীকে তার পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালন পালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে।

৬. নিষিদ্ধ বেগানা পুরুষদের সাথে ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে যতটুকু একেবারেই অনিবার্য হিসেবে অনুমোদিত, তার অতিরিক্ত কোন মেলামেশা করতে দেয়া যাবে না। মসজিদে নামায পড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া করা হচ্ছে অনুমোদিত ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

৭. সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের মাধ্যমে নারীর সুখ শান্তি যাতে ক্ষুণ্ন না হয় এবং দলীয় মতভেদের উর্ধে থেকে সে সমাজ ও পরিবারের সেবার মূল দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারে, সে জন্য নারীকে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান থেকে বিরত রাখা কর্তব্য।

৮. প্রত্যেক নারীকে নারী সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংসারের কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, আমাদের মায়েদেরকে ও নারীদেরকে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

www.amarboi.org

আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।

৯. নারীর আহার বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব বহনে সক্ষম স্বামী, পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয় বিদ্যমান নেই, এমন নিরুপায় পরিস্থিতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই তাকে বাড়ীর বাইরে গিয়ে চাকুরী করতে দেয়া যাবেনা। একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সরকারী কোষাগার থেকে এ ধরনের উপায়হীন ও অসহায়া নারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ ধরনের নারীরা বাড়ীর বাইরে, সাময়িকভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

১০. নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী এবং দেহ ও সাজসজ্জার যতটা আল্লাহর আইনে নিষিদ্ধ, ততটা প্রকাশ করাকে যে কোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন জারী করতে হবে। আর সদুপদেশের মাধ্যমে যে সব নারী নিজের সৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শনী করে পুরুষদের চরিত্র ধ্বংসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছুক নয় তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে এ শাস্তি কতটা কঠোর হবে তা নির্ভর করবে অপরাধিনীর মানসিকতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর।

১১. অশ্লীল যৌন সাহিত্যের এই বিপজ্জনক ছড়াছড়ি যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা জরুরী। এ কাজে জনগণকে সাহায্য করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মতে, এ জাতীয় সাহিত্যের প্রকাশনা বন্ধ করার দায়দায়িত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা আমাদের নারী সমাজের ঘাড়েই অর্পিত। তাদেরকে এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিন্দা ও ধিক্কার দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ কথা

সর্বশেষে আমি যে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া না করেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের মুসলিম জনগণ কোন অবস্থায়ই ইসলামের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে এবং তার আইনকানুন ও বিধিবিধান লংঘন করতে প্রস্তুত নয়। ইসলামের বিধান ও দর্শন যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত, যুক্তিসংগত, নির্ভুল ও অকাট্য সে ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা সংশয় নেই। নারীদের বিষয়ে ইসলামে যা কিছু আছে, তার বিরুদ্ধে যে দিক থেকে যে চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন, মুসলিম আলেমগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ চিরদিন তার মুকাবিলা করে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের ঈমানদার মা বোন ও কন্যারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবেনা। ইসলামী বিধানের বিরোধিতা যারাই করুক, তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সহ সর্বাত্মক প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

এ দায়িত্বটা যদি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি, তা হলে আমাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও তৎপরতা চলতে থাকার জন্য আমরা দায়ী হবনা। আমরা যে এ প্রচারণা ও তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য, এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার

www.amarboi.org

জন্য এবং সমাজে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, সেটাই আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। আমাদের চেষ্টা সাধনার পরও যদি সাফল্য না আসে, ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড স্তিমিত না হয়, এবং তা আমাদের সমাজ ও নব প্রজন্মের ধ্বংস ও ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকে, তাহলেও ইতিহাসের কাঠগড়ায় আমরা অভিযুক্ত হওয়া থেকে অব্যাহতি পাব। আর আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীর প্রশ্নে আমাদের ক্ষেত্রে আল কুরআনের এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবে "তাদের (বনী ইসরাইলের) একটি গোষ্ঠী যখন সংস্কার কার্মীদেরকে বললো যে, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর, তাদেরকে তোমরা কেন সদুপদেশ দিচ্ছ! তখন তারা বললো, আল্লাহর কাছে জবাবদিহী এড়ানোর জন্য এবং ওরা নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করবে এই আশায় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি।"

বস্তুত আমাদের দায়িত্ব পালন, সতর্কীকরণ এবং এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা মিথ্যা, তা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে আমরা যে কোন কসুর করিনি, এটাই আমাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

আমাদের জনগণ যদি উপলব্ধি করে যে, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ও নীতিগত প্রভাব প্রতিপত্তির আওতাধীন থাকার কারণে আমাদের পক্ষে এই ইসলামবিরোধী তৎপরতার চতুর্মুখী অভিযান বন্ধ করা সম্ভব নয়, তাহলেও হতাশ ও হতোদ্যম হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এ কথা এখন কারো জানতে বাকী নেই যে, আমরা যে মহাসত্যের দিকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়ে আসছি, তার প্রতিষ্ঠায় অংগীকারাবদ্ধ ঈমানদার যুবক যুবতীদের এক বিশাল বাহিনী ইতিমধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। তারা ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়াতে দুর্জয় সংকল্পে উজ্জীবিত হ'য়ে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহর দীনের পথে সংগ্রামে তারা কোন বাধাবিপত্তি ও কোন রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটিকে যেমন ভয় পায়না, তেমনি সন্দেহ সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিন্দা কুৎসা ও অপপ্রচারে সংকুচিত ব্যক্তিদের পিছুটানেও পিছপা হয়না। ঈমানের দুর্জয় শপথে বলীয়ান এই বাহিনীর সিপাহীরা আরব অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের সংঘাতের সূচনাকাল থেকেই সত্যের যে বাহিনী মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করে এসেছে, বর্তমানের এ বাহিনী তাদেরই উত্তরসূরী। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সত্যের এ বীর সেনানীরা এগিয়েই যেতে থাকবে এবং মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে থাকবে : 'হে আমাদের রব, একজন আহ্বায়ক আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহ মাফ কর, আমাদের অন্যায় কাজগুলোর কাফ্ফারার ব্যবস্থা কর, এবং আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে মৃত্যু দাও।' (সূরা আলে ইমরান)

www.amarboi.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা